গোধূলিলগ্ন

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৩৬০

প্রকাশক
শ্রীসুরেশচন্দ্র ধর
বৃন্দাবন ধর বুক হাউস
৯৩।৩।১ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯

তৃতীয় সংস্করণ
দাম দুই টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীমধুসূদন নাগ
বৃন্দাবন ধর প্রিন্টিং হাউস
৯৩।৩।১ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯

পরিবেশক
বৃন্দাবন ধর বুক হাউস
২২৬ রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা-১৯

গোধূলি-লগ্ন

—দুঃখের দিনে

গোঁড়া বামুন-পণ্ডিতের বাড়ীর মেয়ে, চোখে তাহার বিসদৃশ ত' একটুখানি ঠেকিবেই। বাড়ীর পাশেই মুসলমান পাড়া। দোরের গাড়ায় মুর্গী চরে, এক-একদিন দেখা যায়, সদর দরজা খোলা পাইয়া সেগুলো উঠানে আসিয়া ঢুকিয়াছে।

বৌ বলে, ছি, ছি, ছি, মা গো মা! জাত-জন্ম আর রইল না দেখছি।'

বলিয়া রাগের মাথায় খ্যাংরা ছুড়িয়া মুরগীগুলাকে হয়ত সে মারিতে ওঠে, কিন্তু শাশুড়ী নিষেধ করেন, শ্বশুর হাসিয়া বলেন, 'তুমি ত' জানো না বৌমা, শোনো, কাছে এসো।'

বৌ কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে শ্বশুর তাহাকে ধীরে ধীরে বুঝাইয়া বলেন, 'তোমার বাবা খুব গোঁড়া বামুন তা জানি মা, আমরাও কম গোঁড়া নই। কিন্তু মুসলমানদের মুর্গী বাড়ীতে এলে জাত-জন্ম সবই যায়, এ কথা তোমায় কে শেখালে মা?'

মাথা হেঁট করিয়া বৌ তাহার পায়ের নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল। কে শিখাইয়াছে সে ঠিক জানে না। বাল্যাবধি শুনিয়া শুনিয়াই শিখিয়াছে। ইহা তাহার আজন্মের সংস্কার।

শ্বশুর বলিতে লাগিলেন, 'ওরাও ভদ্রলোক মা, ওরাও ঠিক আমাদেরই মত মানুষ। একসঙ্গে পাশাপাশি কোনোদিন বাস ত'

করনি মা, করলে বুঝতে। আমরা আজ চার-পাঁচ পুরুষ ধরে' পাশাপাশি বাস করছি।'

সে কথা সত্য। নূর মোহাম্মদ ও অবিনাশ গাঙ্গুলীর বাড়ী দু'খানি একেবারে গায়ে গায়ে লাগানো, ইহার ঘরের খড়ের চাল উহার ঘরে গিয়া ঠেকে।

অবিনাশ বলিলেন, 'নূরুকে যদি দেখতে মা, তাহ'লে বুঝতে মানুষ কত সুন্দর হ'তে পারে। নূরু আমায় দাদা ব'লে ডাকতো, আর তোমার শাশুড়ীকে বলতো বৌ-ঠাকরুণ। আবার ওর ছেলে —গফুরটাও হয়েছে ঠিক তেমনি। আমাকে বলে জ্যেঠামশাই, ঠিক ওর বাপের মতই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। না মা সত্যি বলছি, ওদের সঙ্গে ঝগড়া-বিসম্বাদ কোনোদিন যেন না হয় মা, গফুর আমার ছেলের চেয়েও বেশী।'

বৌ কি বুঝিল জানি না, 'বেশ' বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু উপদেশ দিয়া মানুষকে আর কত দিন বুঝাইয়া রাখা যায়?

দিনকতক বৌ চুপ করিয়াই থাকে, মুর্গী যদি রান্নাঘরের ওপরে গিয়াই ওঠে ত' বৌ রা করে না, রাত্রে স্বামীর সঙ্গে দেখা হইলে সে এই বলিয়া অভিযোগ জানায় যে, পৈতাগুলা তোমাদের ছিঁড়ে ফেলাই উচিত!'

স্বামীর বয়স কম। কাজকর্ম্ম কিছুই নাই, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গ্রামের যাত্রার দলের আখড়ায় গান-বাজনা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখে, স্ত্রী তখনও নিজে না খাইয়া তাহার অপেক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

রাজেন সেদিন অমনি অত রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া শোনে, স্ত্রী বলিতেছে, 'খেয়ে নাও, তারপর বল্‌ব, একটি কাজ তোমায় করতে হবে।'

'কি কাজ?'

'খেয়ে নাও আগে, তারপর বল্‌ব চুপি-চুপি।'

আহারাদির পর মায়া বলিল, 'শোনো, কিন্তু বোকো না বাপু, তাহ'লে ভাল কাজ হবে না বলে' দিচ্ছি।'

এই বলিয়া ভণিতা করিয়া যাহা সে বলিল তাহার সার মর্ম্ম এই যে, সন্ধ্যার আগে রান্নাঘরটা সে খুলিয়া রাখিয়া পুকুরের ঘাটে গিয়াছিল ফিরিয়া আসিয়া দেখে দরজা খোলা পাইয়া তিন-চারটা মুর্গী একেবারে সরাসর তাহাদের রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিয়াছে। তাহাদের তাড়াইতে গিয়া হাতের কাছে কিছুই না পাইয়া শেষে পাথরের নোড়াটা তাহাদের দিকে ছুঁড়িয়া মারে। কিন্তু অত ভারি পাথরের নোড়া একটা মুরগীর গায়ে লাগিবামাত্র সেটা মরিয়া যায়, আর বাকিগুলা ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করিতে করিতে উড়িয়া পালায়। কাহাকেও কিছু না জানাইয়া সেই মরা মুরগীটাকে একটা চুপ্‌ড়ি ঢাকা দিয়া সে লুকাইয়া রাখিয়াছে। সেইটাকেই চুপি চুপি দূরে কোথাও ফেলিয়া দিয়া আসিতে হইবে।—এই কাজ।

ব্যাপারটা এমন গুরুতর কিছু নয়। তবু 'রাগ করিও না' বলা সত্ত্বেও রাজেন রাগ করিল। বলিল, 'ছি ছি, ভারী অন্যায় করেছ তুমি। গফুরদের মুরগী নিশ্চয়ই। বুঝ্‌তে পারলে কি ভাব্‌বে বলত?'

মায়া বলিল, 'বেশ করেছি। কেন, আসে কেন? তাই বলে' মোছলমানদের মুরগী আমাদের হেঁসেলে ঢুকবে নাকি?'

অমন কত ঢোকে ! ধীরে ধীরে তাড়িয়ে দিলেই হ'তো।'

মায়া বলিল, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ তাড়িয়ে দিতেই গিয়েছিলাম, দৈবাৎ গায়ে লেগে গেল তা আমি কি করব? বাবারে বাবা! তোমরাও আর-জন্মে মোছলমান ছিলে, আর এজন্মেই বা কি! গরু খাও না, এই যা তফাৎ! এক-একসময় এখান থেকে আমার পালাতে ইচ্ছে করে।'

রাজেন বলিল, 'তাই পালাও। আমাদেরও হাড়টা জুড়োয় তাহ'লে। ছিঃ! সব কাজেই একটুখানি জ্ঞান-গোচর করতে হয়। ও-সব তোমার ভাল লাগে না ব'লেই কি একেবারে মেরে ফেলতে হবে? ছিঃ!'

এমনি করিয়া দু'কথা চা'র কথা হইতে হইতে একেবারে তুমুল ঝগড়া। মুরগীটা রাজেন ফেলিয়া দিয়া আসিল, কিন্তু ঝগড়া চলিল অনেকক্ষণ ধরিয়া। শেষে তাহার ফল হইল এই যে, আলো নিবাইয়া রাগ করিয়া দু'জনেই দু'জনের দিকে পিছন ফিরিয়া শুইয়া রহিল। কেহ কাহারও সঙ্গে আর কথা বলিল না।

গফুরের বোন ফতেমা আজ কয়েকদিন হইল শ্বশুরবাড়ী হইতে এখানে আসিয়াছে। মেয়েটা অসাধারণ সুন্দরী এবং সুন্দরী বলিয়াই কিনা জানি না, গ্রামের মধ্যে তাহার একটা ভারী বদনাম আছে। এমন কি, শ্বশুরবাড়ী হইতে যতবার সে এ-গ্রামে আসিয়াছে তত-বারই দুষ্ট লোকে একটা না একটা গুজব রটাইয়াছে। মেয়েটা আসিতে না আসিতেই এবার গুজব রটিয়াছে যে, স্বামী তাহাকে বেদম প্রহার করিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, এইবার

বোধহয় সে ফতেমাকে তালাক দিয়া আবার আর-একটা বিবাহ করিবে।

সে যাই হোক্, সে-সব কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই।

পরদিন সকালে একগাদা বাসি এঁটো বাসন লইয়া পুকুরের ঘাটে মায়া সেগুলো মাজিতে বসিয়াছে, এমন সময়ে খান-দুই বাসন হাতে লইয়া ফতেমাও তাহাদের খিড়কির দরজা খুলিয়া ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল।

গতকল্য রাত্রে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া অবধি মায়ার মনের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না, তাহার উপর একই ঘাটে এঁটো বাসন লইয়া ফতেমাকে আসিতে দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গ তাহার জ্বলিয়া গেল; নাক সিঁটকাইয়া হ্যাক্ থু বলিয়া খানিকটা থুতু ফেলিয়া সে বলিল, 'ওলো থাম্, তুই ওইখানে দাঁড়া, আমি উঠে যাই তারপর তুই যা-খুশি তাই করিস্।'

'থাম্‌বার আমার অবসর নেই বৌ, অনেক কাজ!' বলিয়া ফতেমা তাহারই সুমুখে ঘাট হইতে একটুখানি দূরে জলে গিয়া নামিল।

বাসন ফেলিয়া মায়া তাড়াতাড়ি জল হইতে উঠিয়া বলিল, 'বারণ করলাম, তবু নামলি ফতেমা?'

ফতেমা তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'আমি ত' ঘাটে নামিনি বৌ, বে-ঘাটায় নেমেছি।'

মায়া বলিল, 'জলে ত' নাম্‌লি? আমায় চান ত' করতে হবে! বল্‌লে কথা শুনিস্ না, আস্কারা পেয়ে পেয়ে তোদের ত' ভারী বাড় হয়েছে দেখ্‌ছি!'

হাসিয়া ফতেমা তাহাকে রহস্য করিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মায়ার মুখের ভঙ্গী এবং শেষের কথাটা শুনিয়া ফতেমার মুখের হাসি মুখেই মিলিয়া গেল। বলিল, 'ছাখো বৌ, মুখ সামলে কথা বোলো। আমরা নেহাৎ বাউরী বাগদী নই।'

মায়া রুখিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কি বল্লি? মুখ সাম্লে কথা বল্‌ব? তোরা বাগদীর মত নোস্?—বাউরী বাগদী—ত' পথে আছে না, তোরা যে মোছলমান, তোরা যে মেলেচ্ছ, তোরা গরু খাস্ তোরা ছোট লোক, তোদের ছায়া মাড়ালে চান্ করতে হয়।'

ফতেমা বলিল, 'বেশ কর্‌ব, বাসন মাজব, জলে নাম্‌ব, আমাদের যা-খুশি তাই কর্‌বো, পুকুরে আমাদেরও অংশ আছে। এতদিন নিজের মান নিজে রেখেছিলে, তাই আমরাও তোমাদের মান রেখেছিলাম, এবার থেকে—'

বলিয়া বাসন দুইটি হাতে লইয়া ফতেমা আ-ঘাটা হইতে উঠিয়া যে ঘাটে মায়া দাঁড়াইয়াছিল হন্ হন্ করিয়া সেই ঘাটে আসিয়া নামিল। বলিল, 'ততক্ষণ আমি কাজ সেরে নি, তুমিই বরং দাঁড়িয়ে থাকো।'

এত বড় অপমান মায়াকে আজ পর্য্যন্ত কেহই করিতে পারে নাই। রাগে অধীর হইয়া মায়াও আর কোনো কথা না বলিয়া তৎক্ষণাৎ জল হইতে নিজের বাসনগুলা তুলিয়া লইতে গিয়া দেখিল—ফতেমা একটুখানি না সরিলে বাসন তুলিবার উপায় নাই। স্নান তাহাকে আজ করিতেই হইবে ভাবিয়া মায়া তাহাকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়া বলিল, 'সর্ লো সর্! বেশ্যা হারামজাদি, তোর সঙ্গে কথা বল্‌তে ঘেন্না করে!'

কিন্তু অতর্কিতে ঠেলা খাইয়া ফতেমা আর নিজকে সাম্‌লাইতে পারিল না, জলে পড়িয়া গিয়া কাপড় চোপড় সবই ভিজিয়া গেল।

'আর তুই বুঝি সতী-লক্ষ্মী—' বলিয়া ফতেমাও তাহার কাপড় ধরিয়া এমনভাবে এক টান মারিল যে মায়ারও কাপড় জামা সবই ভিজিল।

তাহার পরেই দুজনের হাতাহাতি। মারামারি গালাগালি কিছু আর বাকী রহিল না। এবং শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইল মায়া। ফতেমা দেখিতেই অমনি স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী ; কিন্তু শরীরে জোর বেশী নাই। তবে মুখের জোরে মায়ার চেয়ে কোনও অংশেই কম নয়।

রাজেন বাড়ীতেই ছিল, শুনিল, তাহার স্ত্রীকে ফতেমা অপমানের আর বাকি কিছু রাখে নাই। রাগিয়া আগুন হইয়া তৎক্ষণাৎ সে গফুরের বাড়ীর দিকে ছুটিল। দেখিল, গফুর বাড়ী নাই, দরজা হইতে ফতেমার গলার আওয়াজ শোনা যাইতেছিল, সে তখন একা মায়াকে নয়, তাহাদের ঘর-গুষ্টি সকলকেই এবং হিন্দু-জাতিটাকে যাহা মুখে আসিতেছে তাই বলিয়া গালাগালি দিতেছে।

রাজেন সেইখান হইতেই চীৎকার করিয়া ফতেমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিয়া গেল,—'খবরদার বলছি ফতেমা, চুপ কর, নইলে আমি কিছু বাকি রাখব না বলে' দিচ্ছি।'

ফতেমা সেইখান হইতেই বলিল 'তোর বৌকে চুপ করাগে যা।'

ফতেমা তাহাকে এমন কথা জীবনে কোনদিনই বোধহয় বলে নাই। ভাবিল, মায়া হয়ত এমন একটা কাণ্ড নিশ্চয়ই করিয়া বসিয়াছে যাহার জন্য ফতেমা আজ তাহারও মুখের উপর জবাব দিতে কসুর করিল না।

এক্ষেত্রে চুপ করিয়া থাকা ছাড়া আর উপায় নাই।

রাজেন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বৌকে তাহার যৎপরোনাস্তি গালাগালি সুরু করিল।

শ্বশুর বলিলেন, 'জানি একদিন এমনি একটা কিছু হবেই।'

রাজেন ভাবিল, আসুক গফুর, সে যাহাতে কিছু মনে না করে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর তাহাদের এই লইয়াই আলোচনা চলিতেছিল, এমন সময়ে জমিদারের কাছারী হইতে নায়েবের চাপরাশি আসিল—রাজেনকে ডাকিতে। রাজেন প্রথমে ভাবিয়াছিল খাজনার তাগাদা, কিন্তু চাপরাশিকে জিজ্ঞাসা করিতেই সে অন্য কথা বলিল। বলিল, 'খাজনার তাগাদা নয়, গফুর মিঞা ও তাহার বহিন্ গিয়া তাহার নামে নালিশ করিয়াছে তাই নায়েব ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন - তাহারই বিচারের জন্য।'

এ কাণ্ড যে ঘটিতে পারে তাহা তাহাদের ধারণার অতীত। তবু রাজেনকে যাইতে হইল।

গিয়া দেখে, সত্যই তাই!

একবার একটা পুকুরের মাছধরা লইয়া নায়েবের সঙ্গে গ্রামের একজন প্রজার একটা মামলা হয়, এবং সেই মামলায় নায়েবের বিরুদ্ধে রাজেন সাক্ষী দিয়াছিল, সেই অবধি নায়েবের সঙ্গে তাহার বিশেষ সদ্ভাব নাই।

রাজেনকে দেখিবামাত্র নায়েব বলিয়া উঠিলেন, 'এই যে! আসুন রাজেনবাবু, আসুন!'

'আপনি সম্বোধনটি যে নিছক বিদ্রূপের তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইল না; কারণ এই রাজকর্ম্মচারীটি গ্রামে আসিয়া অবধি 'আপনি' সম্বোধন বোধহয় কাহাকেও করেন নাই।

বলিলেন, 'কি হে, নিজে যা করেছ করেছ, এইবার বৌটাকেও আসামী করে' আদালতে দাঁড় করাতে চাও নাকি, ব্যাপারটা কি বল দেখি?'

রাজেন একবার এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া দেখিল। দেখিল, একটুখানি তফাতে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া গফুর বসিয়া আছে, গফুরের পাশে আর-একজন অপরিচিত মুসলমান ছোকরা,—সম্ভবতঃ ভিন্ন গ্রামের। এবং তাহার পাশে ফতেমা—মাথায় কাপড় দিয়া দেওয়াল ঘেঁষিয়া চুপ করিয়া বসিয়া!

রাজেন ডাকিল, 'গফুর!'

নায়েব বলিলেন, 'গফুরকে' ডেকে কি হবে? ও হারামজাদা আসতে চায়নি, আমিই ওকে ডেকে এনেছি।'

গফুর মুখ ফিরাইয়া তাকাইয়াও দেখিল না।

রাজেন বলিল, 'মেয়েতে মেয়েতে ঝগড়া হয়েছে পুকুরের ঘাটে, এর জন্য এত কেন?'

নায়েব বলিলেন, 'ঝগড়া বোলো না রাজেন, ঝগড়া নয়, মারামারি। রীতিমত মারামারি। তার ওপর তুমি ওদের বাড়ীতে গিয়ে ফতেমাকে অপমান করে' এসেছ—'

রাজেন বলিল, 'অপমান করেছি আমি?'

ফতেমা তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'হ্যাঁ—তুমি।'

অপরিচিত সেই মুসলমান-ছোক্‌রাটি বলিয়া উঠিল, 'হাঁ হাঁ—আলবাৎ! আমি নিজে তখন ওখানে বসেছিলাম।'

রাজেন অবাক্ হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, 'তারপর ?'

নায়েব বলিলেন, 'তারপর আর কি ! যাচ্ছিল আদালতে, আমিই ফরয়ে আনলাম। দাও কিছু জরিমানা, আর নইলে যাও আদালতে। তোমার বৌকে আর তোমাকে দু'জনকেই আসামী করবে বল্‌ছে।'

'হু' বলিয়া নতমুখে কি যেন ভাবিয়া রাজেন জিজ্ঞাসা করিল, 'কে বল্‌ছে ? গফুর ?'

নায়েব বলিলেন, 'গফুর কেন বলবে, বল্‌ছে ফতেমা আর ওর ওই দেবর।'

বলিয়া তিনি সেই আগন্তুক ছোকরাটিকে আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিলেন।

ছোকরাটি বলিল, 'গফুরই বা কেন বল্‌বে না? গফুরই বল্‌ছে শুন! তার বোনের অপমান হলে তার অপমান হয় না? আমরা মুসলমান। মেয়েদের ইজ্জৎ আমাদের আগে দেখতে হয়।'

রাজেন বলিল, 'তা বেশ, গফুর যদি বলে ত' আমি জরিমানা দিয়ে যাচ্ছি। কত জরিমানা ?'

নায়েব বলিলেন, 'পাঁচ টাকা। আমাকে দাও এক টাকা, আর ফতেমাকে অপমান করেছ, ওকে দাও চার টাকা।'

'এক্ষুণি দিচ্ছি। আপনার চাপরাশি পাঠিয়ে দিন আমার সঙ্গে।'

রাজেনের সঙ্গে চাপরাশি গিয়া জরিমানার পাঁচটি টাকা আদায় করিয়া আনিল।

এই হইল ঝগড়ার সূত্রপাত।

রাজেনের বাবা অবিনাশ গাঙ্গুলী বলিলেন, হতভাগা আমার কাছে এবার মুখ দেখাবে কেমন করে' কে জানে !

কিন্তু মুখ সত্যই গফুর আর তাহাদের কাহারও কাছেই দেখায় না। কোন্‌দিক্ দিয়া যে কেমন করিয়া কোন্ সময়ে ঘর হইতে বাহির হয় আবার কখনই-বা ঘরে ঢোকে, কেহ তাহা দেখিতে পায় না।

যে-মুরগী মারার জন্য রাজেন তাহার স্ত্রীর অপমানের আর বাকি কিছু রাখে নাই, সেই মুরগীর দুইটা বাচ্চা সেদিন রাজেন তাহার নিজের হাতেই মারিয়া ফেলিয়া দিল।

গফুর তাহার প্রতিশোধ লইতে কসুর করিল না। গফুর তাহার খামারের ভাঙা প্রাচীরের ধারে-ধারে বাঁকারির বেড়া দিয়া কয়েকটি পেঁপের গাছ লাগাইয়াছিল; রাজেনদের, দুইটা গাই সেদিন সেই পেঁপেগাছে মুখ দিয়াছে বলিয়া গাই দুইটাকে মারিতে মারিতে সে নিজেই লইয়া গিয়া খোঁয়াড়ে দিয়া আসিল।

এমনি করিয়া বিদ্বেষের বহ্নি ধোঁয়াইতে ধোঁয়াইতে শেষে একদিন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

গ্রামের উত্তর প্রান্তে রাজেনদের ধানের জমির নীচেই গফুরের জমি। রাজেন একদিন মাঠে গিয়া দেখিল, তাহার ক্ষেতের সমস্ত জলটুকু আ'লের নীচে ফুটা করিয়া গফুর তাহার নিজের ক্ষেতে লইয়া গিয়াছে। রাজেন কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া ইহার প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

অবশেষে সুযোগ একদিন মিলিয়াও গেল।

সেদিন সন্ধ্যা হইতে ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। রাজেন ভাবিল, আজও সে মাঠের জল কাটিয়া নিশ্চয়ই নিজের মাঠে লইয়া

যাইবে; সুতরাং ইহাই উপযুক্ত সময়। গ্রামের একজন চৌকিদার ও তাহার একজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকিয়া রাজেন মাঠে গিয়া দেখে গফুর তাহার হাতে একটা কোদাল লইয়া নিতান্ত সন্তর্পণে জল কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রাজেন তৎক্ষণাৎ তাহার কাছে গিয়া হাতের ছোট লাঠি দিয়া গফুরের পিঠের উপর মারিল এক বাড়ি। গফুর রুখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই রাজেন চৌকিদারকে ডাকিয়া বলিল, 'ধরো!'

তাহার পর গফুর গেল থানায় চালান। এবং দিনকতক পরে শোনা গেল, তাহার সাতদিন জেল হইয়াছে।

সাতটি মাত্র দিন। ফতেমা ও গফুরের স্ত্রীর গালাগালি শুনিতে শুনিতেই কাটিয়া গেল।

জেল হইতে গফুর ফিরিয়া আসিল একেবারে মরীয়া হইয়া। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই সন্দেহ করিল—গফুর মুসলমানের বাচ্চা; এইবার বোধহয় রাজেনকে সে আড়ালে পাইলে খুন করিয়া ফেলিবে।

কিন্তু খুন সে করিল না।

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রতিহিংসা লইবার দুর্ব্বার আগ্রহে যাহা সে করিল তাহা নিতান্ত অমানুষিক।

গত বৎসর রাজেনের ক্ষেতে ফসল খুব ভালই হইয়াছিল। বছরের এ-সময়টায় খড় বড়-একটা কাহারও খামারেই থাকে না, অথচ রাজেনের খামারে খড়ের তিন-চারটা বড় বড় পালুই ত' আছেই, তাহার উপর প্রকাণ্ড একটা গোলা ভর্ত্তি ধান!

গফুরের তাহা সহ্য হইল না।

খামারের পাশে ইট-দিয়া-বাঁধানো একটি চত্বরের চারিধারে সখ করিয়া রাজেন কয়েকটি ফুলের গাছ লাগাইয়াছিল। মাঝে-মাঝে সেখানে গিয়া সে চুপ করিয়া বসিত।

সেদিনও অমনি বসিয়া আছে, সন্ধ্যা হইতেই চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। বোধকরি অমাবস্যার রাত্রি।

হঠাৎ একসময়ে খড়ের পালুই এর আড়ালে কেমন যেন খুস্ খুস্ শব্দ হইল। রাজেন ভাবিল, খামারে হয়ত শেয়াল কিম্বা কুকুর ঢুকিয়া থাকিবে। যাই হোক, রাজেন ভাবিতেছিল—গফুরকে এরকমভাবে জেল খাটানো তাহার উচিত হইয়াছে কিনা! ভাবিতেছিল, এইবার একদিন সে গফুরের দেখা পাইলে তাহার হাতে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই রাজেন দেখিল, তাহারই চোখের সুমুখে খড়ের একটা গাদার পশ্চাতে দপ্ করিয়া আগুনের মত কি যেন জ্বলিয়া উঠিল। এবং সেই অগ্নিশিখার আলোকে সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল গফুর যেন সেখান হইতে দ্রুতপদে পলায়ন করিতেছে।

রাজেনের মাথার ভিতরেও তখন আগুন জ্বলিয়া গেছে। সে আর একটি মুহূর্ত্তও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। গফুরকে ধরিবার জন্য তৎক্ষণাৎ সে সেখান হইতে উঠিয়া তাহার পিছু-পিছু ছুটিল।

গফুর একেবারে হাতে হাতে ধরা পড়িয়া গেছে।

গফুরও যত ছুটে, রাজেনও তত!

গ্রাম পার হইয়া মাঠের উপর দিয়া গফুর প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল।

চীৎকার করিয়া রাজেন বলিল, 'চল্ তুই যেথানে যাবি, তোকে আজ খুন করে' ফেলব।'

এই বলিয়া ছুটিতে ছুটিতে ফাঁকা মাঠের উপর দিয়া তাহাব অনেকখানি পথ চলিয়া আসিল। কিন্তু এমন কবিয়া অন্ধকাবে কতক্ষণই বা ছুটিবে! গফুব হঠাৎ হোচট্ খাইয়া যেমন তাহাব গতিবেগ একটুখানি থামাইয়া ফেলিযাছে, রাজেন তৎক্ষণাৎ তাহাব ঘাড়ে গিযা পড়িল। তাহার পর কিল, চড, ঘুষি,—তাবপর দু'জনেই মাঠের মাটিতে গড়াগড়ি।

বাজেন বলে, 'শালা ছোটলোক মোছলমান কোথাকার।'

গফুর বলে, 'তুই শালা ছোটলোক হিন্দু কোথাকার।'

গফুর একবার রাজেনের ওপব ওঠে, বাজেন একবাব গফুবেব ওপব। পশ্চাতে যে একটা ভযানক গোলমাল উঠিযাছে সেদিকে কাহাবও লক্ষ্য নাই।....

মারামারি কবিতে কবিতে হঠাৎ একসময কোলাহল শুনিয়া দু'জনেই পিছন ফিবিযা তাকাইল। দেখিল, সর্ব্বনাশ। বক্তবর্ণ অগ্নিব লেলিহান শিখা তখন ধূ ধূ করিয়া বড ভযঙ্কর ভাবেই জ্বলিযা উঠিযাছে। সমস্ত গ্রামেব সমস্ত নবনাবীব গগনভেদী আর্ত্ত চীৎকারে কর্ণ যেন বধির হইযা আসে।

মারামারির কথা অকস্মাৎ তাহাবা যেন ভুলিযা গেল। বাজেন ছুটিল গ্রামের দিকে, গফুবও ছুটিল।

ছুটিয়া তাহারা নিজেদের বাড়ীর কাছে আসিযা দেখিল, সর্ব্বভুক অগ্নিদেবতাব ক্ষুধিত জিহ্বা হিন্দু মুসলমানেব প্রভেদ পার্থক্য মানে নাই, রাজেন ও গফুরের পাশাপাশি দু'খানি বাড়ীই গ্রাস করিয়া

সর্ব্বনাশা আগুন তখন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কতক জিনিষ টানিয়া বাহির করা হইয়াছে, কতক বা হয় নাই। গ্রামের বহু লোক আগুন নিবাইবার জন্য আসিয়া জড়ো হইয়াছে। রাজেনের বৃদ্ধ পিতা নিতান্ত অসহায়ভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। গফুরের স্ত্রী হায় হায় করিতেছে, আর সব চেয়ে অবাক্ কাণ্ড—আজ এই দুঃখের দিনে ফতেমা ও মায়ার ভাব হইয়া গিয়াছে। আগুনের ভিতর হইতে কি একটা জিনিষ টানিয়া বাহির করিতে গিয়া ফতেমার একখানা হাত আগুনের আঁচে ঝলসিয়া গিয়াছে, আর সেই পোড়া হাতের শুশ্রূষা করিবার জন্য মায়া তখন তাহাকে সঙ্গে লইয়া ইতস্ততঃ ছড়ানো জিনিষপত্রের মাঝখানে একটুখানি নারকেলের তেল খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

—দুঃস্বপ্ন

ওই উকিল-ছোকরাটি ছাড়া সে জমিদার-বংশের আজ আর কেহ কোথাও নাই। গ্রাম ছাড়িয়া দিয়া সে আজ শহরে আসিয়া বাস করিতেছে। গ্রামখানি অবশ্য শহর হইতে বেশি দূরে নয়,—ডেলি প্যাসেঞ্জারী করিয়াও তাহার কাজ চলিতে পারে, কিন্তু গ্রামে তাহার আর নিজের বলিতে কিছু নাই—জমিদারী নিশ্চিহ্ন হইয়া গেছে,—চাষের জমি যে-কয়-বিঘা ছিল তাহাও বিক্রি করিয়াছে; আছে মাত্র—গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে প্রকাণ্ড একটি আম-বাগানের মাঝখানে মস্ত বড় একখানি দোতলা বাড়ী। বাড়ীখানিও সে বিক্রি করিবার চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, কিন্তু কিনিবার লোকের অভাবে সেখানি এখনও তেম্‌নি পড়িয়া আছে। তাহার না আছে সংস্কার, না আছে কিছু,—জরাজীর্ণ অট্টালিকা গ্রামপ্রান্তে ঠিক বিভীষিকার মত খাড়া দাঁড়াইয়া থাকে। সন্ধ্যার পর সে-পথ দিয়া লোকজন কেহ যাওয়া-আসা করে না, এবং তাহাকে লইয়া গ্রামবাসীর মুখে মুখে কত কিংবদন্তী, কত ভূতুড়ে গল্প যে বিরচিত হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

বছরের পর বছর ধরিয়া সে বাড়ীখানি অমনি খাঁ খাঁ করে;—উঠানে আগাছার জঙ্গল, আনাচে-কানাচে নিশাচর পাখীরা বাসা বাঁধিয়াছে, দেওয়ালের চুন-বালি খসিয়া খসিয়া বর্ষায় নোনা ধরিয়া কি অপরূপ চেহারাই যে তাহার হইয়াছে তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার নয়; ঝড়ে-বাতাসে সার্সি-ভাঙ্গা জানালা-কপাট দড়াম্‌ দড়াম্‌ করিয়া

দেওয়ালের গায়ে গিয়া লাগে,—অমানিশার গভীর অন্ধকারে কিম্বা কোনও বৈশাখী ঝড়ের রাত্রে মনে হয় যেন একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ অসহায় দানব তাহার দুই হাত দিয়া বুক চাপড়াইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে।

ইট-বাহির-করা ফটকের দুইটা স্তম্ভের পাশে দুইটি বটগাছ—সম্পদের দিনে হয়ত, তাহারা বাড়ীর শোভা বর্দ্ধন করিত, কিন্তু আজকাল তাহারা তাহাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া, নাবাল নামাইয়া বিকটাকার দুই প্রেতমূর্ত্তির মত অন্ধকারে দাঁড়াইয়া থাকে, সামান্য একটুখানি বাতাসের আন্দোলনে চীৎকার করিয়া ওঠে।

বহুকাল পরে এ-হেন বাড়ীতেও একদিন এক ভাড়াটে জুটিল। ভাড়াটে এক প্রৌঢ় ডাক্তার—শহরের সিভিল সার্জ্জেন্। বাঙালী ক্রিশ্চান। শহরে তাঁহার মনের মত বাড়ী পাইলেন না বলিয়া এখানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

শুনিলেন, বাড়ীটা ভূতুড়ে এবং মানুষের পক্ষে একাকী এখানে বাস করা অসম্ভব।

ডাক্তার ঈষৎ হাসিলেন। বলিলেন, 'ভূতের ভয় আমি করি না।'

ঘর-দোরের ধূলা ঝাড়াইয়া, চূনকাম করাইয়া, আসবাব-পত্র দিয়া তিনি ঘর সাজাইলেন, বাগান পরিষ্কার করাইলেন; আগাছার জঙ্গল সাফ্ হইয়া গেল, দরজায় জানালায় রঙিন পর্দ্দা ঝুলিতে লাগিল. ঘরে ঘরে আলো জ্বলিল। ডাক্তার হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।—চমৎকার বাড়ী, চারিদিক ফাঁকা, আলো-বাতাসের অভাব নাই। অবিবাহিত একা মানুষ,—এম্‌নি বাড়ীই তিনি ভালবাসেন।

এত বড় ডাক্তার, দেখিতে দেখিতে নীচের প্রকাণ্ড ‘হলে’ নানা-রকমের রুগী আসিতে লাগিল, পরমানন্দে তিনি চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দেখেন, সন্ধ্যার পর কেহ আর আসে না, নিস্তব্ধ গ্রামপ্রান্তে শুধু ঝিঁঝিঁ-পোকা ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতে থাকে, মাঝে-মাঝে পত্র-পল্লবের মর্ম্মর শব্দ শোনা যায়, দূর প্রান্তরে সমস্বরে শৃগাল ডাকিয়া ওঠে, গ্রাম্য কুকুরের একঘেয়ে চীৎকার যেন থাকিয়া থাকিয়া নৈশ নিঃশব্দ অন্ধকারটাকে বিদীর্ণ করিয়া ডাক্তারের কানে আসিয়া বাজে। শয্যায় শয়ন করিয়া মশারি ফেলিয়া দিয়া আলো নিভাইয়া ডাক্তার ভাবেন, ভালো কথা, সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর রাত্রে আর তাঁহাকে কেহ বিরক্ত করিতে আসিবে না।

ভূত-প্রেতে বিশ্বাস তাঁহার নাই। নিজে বৈজ্ঞানিক, সুতরাং বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া যাহা প্রমাণিত হয় না, মানুষের যাহা কপোল কল্পিত, যাহা অসম্ভব, যাহা অদৃশ্য,—তাহাতে বিশ্বাস তিনি করেন কেমন করিয়া ?

কিসের যেন একটা শব্দে ডাক্তারের হঠাৎ একদিন ঘুম ভাঙিয়া গেল। জাগিয়া উঠিতেই মনে হইল, খট্‌খট্‌ করিয়া খড়ম পায়ে দিয়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সিঁড়ি ধরিয়া কে যেন নীচে নামিয়া যাইতেছে। টর্চ্চ হাতে লইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরে আসিয়া দেখেন, কেহ কোথাও নাই। সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার শিহরিয়া উঠিল। পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। কিন্তু রাত্রে ভাল ঘুম হইল না।

দিন-কয়েক পরে, আবার একদিন রাত্রে ঠিক তেমনি শব্দ।

সেদিনও আবার তেমনি টর্চ্চ লইয়া উঠিলেন। উঠিতেই দেখেন সিঁড়ির রেলিংএর পাশ দিয়া মস্ত বড় একটা ইঁদুর তাড়াতাড়ি পলায়ন করিতেছে, আর সিঁড়ির একেবারে নীচের ধাপে লম্বা একটা গরুর হাড় পড়িয়া আছে।

হাড়টা হাত দিয়া ডাক্তার সেখান হইতে বাগানের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। ব্যাপারটা বুঝিতে সেদিন তাঁহার আর বিশেষ কষ্ট হইল না। মৃদু হাসিয়া নিশ্চিন্ত-মনে সেদিন তিনি চমৎকার ঘুমাইলেন। নির্ব্বোধ মানুষ ইহাকেই ভূত মনে করিয়া ভয়ে অস্থির হয়।

বিবাহ তিনি করেন নাই। কেন করেন নাই কে জানে? হইতেও পারে বা, হয়ত তিনি তাঁহার মনের মত মেয়ে খুঁজিয়া পান নাই, কিম্বা হয়ত কাহাকেও ভালবাসিয়াছিলেন। যাই হোক, সেজন্য মনে তাঁহার কোনও ক্ষোভ বা দুঃখ আছে বলিয়া ত' বিশ্বাস হয় না। দিব্য নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার, সদানন্দময় পুরুষ; নিয়ত সংযত শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের মত তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ দেহ, প্রশস্ত ললাট, সমুন্নত নাসিকা, আয়ত দুইটি চক্ষু;—দূর হইতে সহসা দেখিলে ধূমলেশহীন জ্যোতিঃশিখা বলিয়া ভ্রম হয়। অথচ ইহার জন্য কোনও নারীচিত্ত কোনও দিন ক্ষুব্ধ ক্ষুধাতুর হইয়া উঠে নাই—ইহাই আশ্চর্য্য।

ডাক্তারবাবু ক্রিশ্চান, তার উপর বাড়ীটা ভূতুড়ে,—লোকজন কেহই সহজে তাঁহার বাড়ী কাজ করিতে চায় না। শেষে অতি কষ্টে শহর হইতে চারজন লোক পাওয়া গেল। তিনজন চাকর একজন রাঁধুনী।

রাঁধুনীর নাম তেওয়ারি। জাতিতে পশ্চিমা ব্রাহ্মণ, গলায় সাদা

ধপ্‌ধপে পৈতার গোছা। বলে, "আজ্ঞে না, খিরিস্তান্‌ ফিরিস্তান্‌ আমি মানি না। ইংরেজের রাজ,—ওরাই যখন খিরিস্তান্‌, তখন জাতটি যে আমাদের আছে তারই বা কি মালুম!"

ভাল কথা।

আর তিনজন ব্রাহ্মণ নয়। কি জাতি, ডাক্তারবাবু একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখন আর সে কথা তাঁহার মনে নাই। একজনের নাম গোকুল, একজন গোবিন্দ, আর একজন রাম-বিরিজ। তাহারা চাকরের কাজ করিবে।

আরও লোক হইলে তাঁহার ভাল হয়। অত বড় বাড়ী, নীচে ডাক্তারখানা; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে, কাজকর্ম্ম করিতে বিস্তর লোকের দরকার।

অথচ লোক আসে। কাজকর্ম্ম করে, আবার দিনকতক পরেই মাহিনা চুকাইয়া লইয়া ভূতের ভয়ে বাড়ী ছাড়িয়া পলায়।

যাইবার সময় মনিবের জন্য সকলেই আফশোষ করে। এমন মনিব জীবনে তাহারা কখনও পাইবে না, কিন্তু উপায় নাই, বাঁচিয়া থাকিবার ব্যবস্থা তাহাদের আগে করিতে হয়।

কেহ বলে, 'রাত্রে নাকি সে বাগানের ভিতর আলো জ্বলিতে দেখিয়াছে।' কেহ বলে, 'বাছুরের মত কি একটা জানোয়ার প্রত্যহ ওই বটগাছের তলায় লাফালাফি করে।' আবার কেহ কেহ বা এই বলিয়া অভিযোগ জানায়—যে, এ-বাড়ীতে আসিয়া অবধি যে-সব অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে এবং যেগুলি তাহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছে,—সে-সব কথা স্পষ্ট দিবালোকে বসিয়া শুনিলেও মানুষের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে।

ডাক্তারবাবু জোর করিয়া কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে চান না। টাকাকড়ির হিসাব চুকাইয়া দিয়া বলেন, 'যাও। যার ইচ্ছা হবে সে-ই থাকবে, আর যার ইচ্ছা হবে না, তাকে জোর করে' রেখে লাভ কি!'

কিন্তু ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় জানি না,—তেওয়ারি, গোকুল, গোবিন্দ ও রাম-বিরিজ টিঁকিয়া গেল। টিঁকিল যে কি কারণে ডাক্তারবাবু তাহা জানিতেন না। তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার মত অবসরও তাঁহার ছিল না।

কম্পাউণ্ডার দু'জন বাইকে চড়িয়া সহর হইতে এখানে আসে। একবেলা এইখানেই খায়, তাহার পর সমস্ত দিন থাকিয়া সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই তাহারা পলায়ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ওঠে।

তাহাদেরই মধ্যে একজন সে দিন ডাক্তার বাবুর কাছে আসিয়া নালিশ জানাইল যে, ভাইনাম্ গেলিসিয়ার বড় বড় দুইটা বোতল ডিস্পেন্সারীর আলমারির ভিতর হইতে চুরি গিয়াছে। কে চুরি করিয়াছে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও টের পাওয়া গেল না, তবে তাহার মনে হয়—ইহা চাকরদের কাজ।

কথাটাকে ডাক্তারবাবু হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন, 'পাগল! চাকরবা মদ দিয়ে করবে কি?'

কম্পাউণ্ডার-ছোকরাটি হাসিল। বলিল, 'বিক্রি করবে। খেতেও পারে হয়ত।'

ডাক্তারবাবু বিশ্বাস করিলেন না; বলিলেন, 'যাক্ গে। ও তোমরা খরচ লিখে দিও! চাকরদের কিছু বোলো না।'

যাহা বলিবার তাহা সে আগেই বলিয়াছিল। আর-কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না।

দিন-তিনেক্ পরে রাত্রে একদিন ভীষণ চীৎকারের শব্দে ডাক্তারবাবু নীচে নামিয়া আসিলেন। দেখিলেন, নীচের হল-ঘরে তেওয়ারি, গোকুল, গোবিন্দ ও রাম-বিরিজ্—চারজনে জড়াজড়ি করিয়া বু-বু করিয়া চীৎকার সুরু করিয়াছে। আলো লইয়া ডাক্তারবাবু তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। এতক্ষণে ধড়ে যেন তাহাদের প্রাণ আসিল। তেওয়ারি সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ডাক্তারবাবুর পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিল, 'আজ আমরা ভূত দেখেছি বাবু।'

'কি রকম?'

বাহিরে বাগানের দিকে আঙুল বাড়াইয়া তেওয়ারি বলিল, 'এইখানে। কালো রঙের একটা পেত্নী ওই গাছের ওপর পা ঝুলিয়ে বসেছিল বাবু, আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

ডাক্তারবাবু দেখিলেন, কথা তাহার শেষ হইতে না হইতেই গোকুল, গোবিন্দ ও রাম-বিরিজ্ প্রত্যেকেই উঠিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিল এবং সকলেই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তাহারাও দেখিয়াছে।

গতিক তাহাদের বিশেষ ভাল বলিয়া বোধ হইল না। তেওয়ারি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া টলিতে টলিতে হাতজোড় করিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

সেদিনের মদ চুরির কথা ডাক্তারবাবুর মনে ছিল। বলিলেন, 'ওগুলো আর অমন করে' খাস্‌নে বাবা। ও সব খেলে ভূত দেখতে দেরি হয় না।'

হাত নাড়িয়া না না বলিয়া কথাটাকে তেওয়ারি অস্বীকার করিতে যাইতেছিল, এমন সময় নিতান্ত সমঝদারের মত গোবিন্দ ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিল. 'হ্যাঁ বাবু, ঠিক বলেছেন, বড় জবর নেশা।'

ডাক্তারবাবু বুঝিলেন সবই। কিন্তু সে সম্বন্ধে আর কোনরূপ উচ্চবাক্য না করিয়া বলিলেন, 'ঘরে খিল বন্ধ করে' তোরা শুয়ে পড়, আলো নিয়ে আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি, ভয় নেই।'

খিল বন্ধ করিবার জন্যই তেওয়ারি বোধ করি টলিতে টলিতে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রত্যহ প্রত্যূষে দেখা যায়, গ্রাম হইতে এক ভদ্রলোক ডাক্তারবাবুর বসিবার ঘরখানিতে আসিয়া বসে। ডাক্তারবাবুকে নমস্কার করিয়া প্রত্যহ তাঁহার কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহার পর ইংরেজি খবরের কাগজটা একবার উল্‌টাইয়া-পাল্‌টাইয়া দেখিয়া বলে, 'এই খবরের কাগজ পড়ার অভ্যেস্ আমার এমন ছিল যে, কুড়ি বছর ধরে' 'বঙ্গবাসী' কাগজখানার গ্রাহক ছিলাম।'

ডাক্তারবাবু হাসিয়া একবার তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলেন, 'এখন আর নেই বুঝি?'

ঘাড় নাড়িয়া লোকটি বলে, 'না। ছেড়ে দিয়েছি। দিয়েছি বটে, কিন্তু এখনও তারা ললিত মুখুজ্যেকে চেনে। বঙ্গবাসী-আপিস থেকে আমার নামে চিঠি-পত্তর এখনও আসে। দুঃখু করে' লেখে—এতদিনের পুরনো গ্রাহক আপনি ছেড়ে দিলেন কেন…। আমি আর তার জবাব-টবাব দিই না।—সকালে আপনি চা খান?

ডাক্তারবাবু বলেন, 'হ্যাঁ খাই। কেন বলুন ত? আপনি খাবেন?'

মুখুজ্যে হাসিয়া বলে, 'ওই একটা ছেলেবেলার অভ্যেস্ আমি এখনও ছাড়তে পারিনি।'

ডাক্তারবাবু তৎক্ষণাৎ একটা চাকরকে ডাকিয়া চা দিতে বলেন।

চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া মুখুজ্যের চোখ দুইটি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। বলে, 'খাসা রং হয়েছে চায়ের। আহা, এমনটি আর কোনদিন আমার বাড়ীতে হলো না। আমার বাড়ীর মেয়েদের মশাই এমনি মজা, পোলাও বলুন, মাংস বলুন, কাবাব কোর্মা যা বলুন—বেঁধে দেবে খাসা, কিন্তু এই চায়ের বেলা—' ঘাড় নাড়িয়া মুখের চেহারাখানা একেবারে কিম্ভূতকিমাকার করিয়া মুখুজ্যে বলে, 'পারবে না।'

সকালবেলা অনেকগুলি রুগী বিদায় করিতে হয়। বসিয়া বসিয়া গল্প করিবার অবসর ডাক্তারবাবু পান না। বলেন, 'আপনি রোজ এইখানে এসে দু'বেলা চা খেয়ে যাবেন। আমি খুব খুশী হব।'

বলিয়াই উঠেন। ঈষৎ হাসিয়া নমস্কার করিয়া বলেন, 'অনেকগুলি রুগী বসে আছে। উঠতে হলো, কিছু মনে করবেন না।'

ললিত মুখুজ্যেকে আজকাল আর চায়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। আসিবামাত্র, ডাক্তারবাবু থাকুন আর নাই থাকুন, তেওয়ারি কিম্বা চাকরদের মধ্যে যে-কেউ একজন চায়ের বাটিটি তাহার সুমুখে ধরিয়া দিয়া যায়।

কিন্তু কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে না পাইলে মুখুজ্যে যেন হাঁপাইয়া ওঠে। ডাক্তারবাবু উপস্থিত না থাকিলে সে গোকুল, গোবিন্দ, রাম-বিরিজ, তেওয়ারি—যাহাকে হোক্ কাছে ডাকিয়া বলে, 'বোসো।'

ডাক্তারবাবুর বসিবার ঘরে চেয়ারের উপর তাহারা বসেই বা কেমন করিয়া। দাঁড়াইয়া থাকিয়াই বলে, 'বলুন কি বল্‌ছেন।'

ভূতের ভয় তাহারা পায় কি না সেই কথাই মুখুজ্যে শুনিতে চায়। বলে, 'আপনি কোনোদিন?'

গোবিন্দ বলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, একদিন দেখেছিলাম। ডাক্তারবাবু ভাগ্যিস্ তখন আলো নিয়ে নীচে নেমে এলেন, নইলে সেইদিনই আমরা গিয়েছিলাম!'

মুখুজ্যে চা খাইতে খাইতে গোবিন্দকে উপদেশ দেয়। বলে, 'খুব সাবধানে থেকো বাবা, এ-বাড়ী বড় সহজ বাড়ী নয়। আমরা তখন ছেলেমানুষ এখনও মনে আছে, একদিন শুন্‌লাম, বাবুদের ছোট-বৌ নাকি বাগানের ওই একটা গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। দেখতে এলাম। লোকে লোকারণ্য। বৌটিকে তখনও গাছ থেকে নামানো হয় নি। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ এলো। বাবুদের যে কত টাকা খরচ হলো সেবার,—বাপ্‌রে বাপ্! তারপর থেকে দেখা যেতে লাগলো—বছরের পর বছর, বাড়ীতে একটা না একটা কিছু হয়ই। কখনও বা কেউ শুনি জলে ডুবে মরেছে, কেউ মরেছে বিষ খেয়ে,—কেউ-বা গলায় দড়ি দিয়ে। এমনি হতে হতে পাঁচ ছ' বছরের ভেতর বাবুদের বাড়ী একেবারে সাফ্ হয়ে গেল। এ বাড়ীতে ভূত থাকবে না ত' থাকবে কোথায়! ধন্যি ডাক্তারবাবুর সাহস, তাই এখানে বাস করতে এলেন, আর কেউ হলে পারতো না, এ আমি হাঁক মেরে বলে দিতে পারি। তোরা বাবা একটু সাবধানে থাকিস্,' রাত-বিরেতে ঘর থেকে বেরোস্‌নি, বুঝলি বাবা গোবর্দ্ধন!'

গোবিন্দ বলিল, 'আমার নাম গোবিন্দ।'

ললিত মুখুজ্যে বলিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, গোবিন্দ! গোবর্দ্ধন, গোবিন্দ একই কথা।'

বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া কালোরঙের গলায় বোতাম-দেওয়া শতচ্ছিন্ন কোটখানির পকেট হইতে বিড়ি বাহির করিয়া মুখুজ্যে দেশলাই জ্বালিয়া টানিতে লাগিল। বলিল, দাঁড়া তোদের ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস্ করব—ভয়-টয় কোনদিন পেয়েছিল কি না! পাবে একদিন—নিশ্চয়ই ভয় পাবে। এ ত' আর ছেলেখেলা নয় বাবা! দিনের বেলা এ-বাড়ী ঢুকতে গিয়ে আমার ত' গা ছম্ ছম্ করে।'

এমন সময় ডাক্তারবাবু আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন।—'নমস্কার! এসেছেন আপনি?'

ডাক্তরবাবুকে দেখিবামাত্র গোবিন্দ চলিয়া গেল। ডাক্তারবাবু তাঁহার নির্দ্দিষ্ট চেয়ারের উপর বসিয়া চাকরকে চা আনিতে বলিয়া মুখুজ্যের মুখের পানে তাকাইলেন। বলিলেন, 'ওষুধের সব ব্যাপার-গুলো বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম কম্পাউণ্ডারদের।'

মুখুজ্যে বলিল, 'তা ত' হবেই। ও-ব্যাটারা জানে কি? বেটাদেব ভাগ্যি ভাল তাই চাকরি পেয়ে গেছে আপনার কাছে। ওষুধ সম্বন্ধে আমার যা জ্ঞান আছে ওদের তা নেই। শুনবেন তাহ'লে?' বলিয়া একটা ঢোক্ গিলিয়া একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া মুখুজ্যে আবার বলিতে লাগিল, 'একদিন আমার এক নাতির হলো অসুখ। মেয়ের ছেলে। মেয়েটা কেঁদেকেটে বলতে লাগলো—'বাবা, ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।' আমি বল্লাম, 'দাঁড়া না পাগলী, ক্ষেপেছিস্ কেন, আমার চিকিৎসাটাই ছাখ্ আগে। কিন্তু মেয়েটা কিছুতেই শুনলে না। শেষে কি আর করি, নিয়ে গেলাম সহরে।

জ্যোতিষ ডাক্তারকে দেখালাম। কথায় কথায় ডাক্তারের সঙ্গে ওষুধের কথা উঠলো। আমার কথাবার্তা শুনে ডাক্তারবাবু ত' অবাক্! জিজ্ঞেস্ করলেন, 'আপনি কি কোনও ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার-টম্পাউণ্ডার ছিলেন নাকি?' বল্‌লাম, 'না মশাই।' ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, 'আপনি খুব ভাল কম্পাউণ্ডারী করতে পারেন।' আমি বল্‌লাম, 'পারি ত' মশাই সবই, কিন্তু মনের মত লোক পাই কোথায়?'

ডাক্তারবাবুর চা আসিতেই কথাটা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল; মুখুজ্যে জিজ্ঞাসা করিল, 'কত করে' মাইনে দেন ওদের?'

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'একজনের পঁয়ত্রিশ, একজনের ত্রিশ।'

'তাহ'লে ত' বেশ এক-রকম; ঘরের খেয়ে বাইকে চড়ে' আসে—'

আরও কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ডাক্তারবাবুকে উঠিতে হইল।

গ্রামের পথে সেদিন মুখুজ্যের সঙ্গে সদানন্দর দেখা। এই সদানন্দ লোকটি বড় গরীব, জাতিতে ব্রাহ্মণ, লোকের বাড়ী ভাত রাঁধিয়া সংসার চালায়। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরিয়া বেচারার চাকরি-বাকরি কিছুই নাই, দুর্গতির একশেষ হইয়াছে। বলিল, 'শুন্‌লাম তুমি নাকি রোজ ওই ডাক্তারখানায় যাও, আমার একটা কাজের কিছু সুবিধে করে' দিতে পার মুখুজ্যে?'

মুখুজ্যে বলিল, 'খিরিস্তানের বাড়ী ভাত রাঁধবি কি রে? ডাক্তার যে খিরিস্তান।'

সদানন্দ বলিল, 'তা হোক্ ভাই' তোমার হাতে ধরে—'

বলিয়া সত্যই সে তাহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিতে যাইতেছিল, মুখুজ্যে বলিল, 'শোন্ তবে, বোস্ এইখানে বলি।'

এই বলিয়া পথের ধারে কাটা অশ্বত্থ গাছের যে গুঁড়িটা পড়িয়াছিল, তাহারই উপর নিজেও বসিল, সদানন্দকেও বসাইল। বলিল, 'আমার অবস্থাও ত' জানিস্—।'

সদানন্দ বলিল, 'তোমার ভাবনা কি দাদা, আমার তুলনায় তুমি ত' রাজা।'

'দূর পাগল! যে দিনকাল পড়েছে, তাতে দেখচিস্ না—আগে আমি 'বঙ্গবাসী' কাগজ নিতাম, আজকাল ছেড়ে দিয়েছি। তাই ভাবছিলাম ঘরে বসে যদি একটা কম্পাউণ্ডারীর কাজ-টাজ···তা টোপ্ আমি একবার ফেলে এসেছি,—বুঝলি? কিন্তু নিজের কথা নিজে আর কত বলা যায়! কাল থেকে চল্—তোকেও নিয়ে যাই সঙ্গে করে'। তুই আমার খুব অনুগত হয়ে থাকবি, আর মাঝে মাঝে ডাক্তারীর কথা, ওষুধের কথা উঠলেই খুব করে' আমার প্রশংসা করে' দিবি। কিন্তু বেশ বুদ্ধিমানের মত···ধর্ ওষুধের কথা উঠলো। ডাক্তারবাবুকে শুনিয়ে শুনিয়ে তখন তুই বলে' উঠবি—'ওষুধের কথা আর ললিত-ভায়ার কাছে কেন? ও আছে বলেই আমাদের গাঁয়ের রুগীগুলো তবু বাঁচে।'

সদানন্দ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'সে আমি ঠিক পারব, তুমি আমাকে নিয়ে চল মুখুজ্যে।'

সেইদিন হইতে মুখুজ্যে আর একা যায় না, সদানন্দকেও সঙ্গে লইয়া যায়।

অথচ সুবিধামত ঔষধের কথা কোনদিনই আর ওঠে না। কথা

কহিতে কহিতে কথার ধারাটাকে মুখুজ্যে সেইদিক দিয়াই লইয়া যাইতে চায়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারে না। ডাক্তারবাবু অন্য পথ ধরেন।

মুখুজ্যের কথায়-বার্ত্তায় তাহার মনের কথার খানিকটা আভাস ডাক্তারবাবু পাইয়াছিলেন। তাহার মত অত বড় বিজ্ঞ কম্পাউণ্ডারের প্রয়োজন তাঁহার ছিল না বলিয়াই হোক, কিম্বা অন্য কোন কারণেই হোক্, মুখুজ্যের মুখে ঔষধের প্রসঙ্গ উঠিলেই কৌশলে তিনি তাহা চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িয়া বসেন।

এবং নিজের কথা ওঠে না বলিয়া সদানন্দর কথাও মুখুজ্যে কোনদিনই উত্থাপন করে না।

দু'জনেই প্রত্যহ সেখানে যায়—আর বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে।

সদানন্দ মনে মনে ভাবে, ইহার চেয়ে সোজাসুজি ডাক্তারবাবুকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেই ভাল হইত। মুখুজ্যেকে বলে, 'হাঁ হে মুখুজ্যে, কই আমার কথা ত' ভাই বললে না একদিনও। আমি নিজেই একবার বলে' দেখি,—কি বল?'

মুখুজ্যে বলে, 'খবরদার খবরদার, অমন কাজটি করিস্ না। আমারটা আগে হয়ে যাক্, তারপর তোর ব্যবস্থা আমি সেইদিনই করে' দেবো।'

কি আর করিবে, সদানন্দ চুপ করিয়া থাকে।

কিন্তু তাহার কপাল ভাল। বেশিদিন তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হয় না।

গোবিন্দকে সেদিন কাছে ডাকিয়া এই ভূতুড়ে বাড়ীর অতীত ইতিহাস বলিয়া দিয়া ললিত মুখুজ্যে তাহাকে কি ভয় যে ধরাইয়া দিয়াছিল, তাহা একমাত্র গোবিন্দই জানে।

সেইদিন হইতে ক্ষণে ক্ষণে তাহার শুধু ওই ভূতের কথাই মনে হয়। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিলে আর সে ঘরের বাহির হইতে পারে না। ঘরের ভিতরে একসঙ্গে সকলে মিলিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতেও হঠাৎ হয়ত তাহার জানালার দিকে নজর পড়িয়া যায়; বাহিরে বাতাসের আন্দোলনে গাছপালা মড মড্ করিতে থাকে,—গোবিন্দর আপাদ-মস্তক তৎক্ষণাৎ শিহরিয়া ওঠে।

অথচ, এ-কথা সে কাহাকেও বলিতে পারে না।

মদের যে দুইটা বোতল তাহারা চুরি করিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটা ত' সেদিনই প্রায় শেষ হইয়াছিল, বাকি আর-একটা শেষ করিবার সুযোগ-সুবিধা তাহারা কোনদিনই করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

ডাক্তারের জন্য ভিন্নগ্রাম হইতে সেদিন কে যেন খানিকটা কাঁচা মাংস পাঠাইয়া দিয়াছিল। তেওয়ারি ভাবিল, বোতলটা শেষ করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়।

ডাক্তারবাবু মাছ মাংস খান না। আহারাদির পর আলো নিভাইয়া তিনি তাঁহার উপরের ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন। অন্ধকার রাত্রি। চারিদিক্ নিস্তব্ধ। নীচের হল-ঘরে তখন তেওয়ারি, গোকুল, গোবিন্দ ও রাম-বিরিজের মজ্‌লিস বসিল। তেওয়ারি আগে হইতেই সকলকে সাবধান করিয়া দিল।—

'দেখিস্ বাবা, সেদিনের মত ভূত-টুত দেখিস্ না কেউ।'

গোবিন্দ ছাড়া সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে তখন ঘরের এককোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছে।

দু'এক পাত্র পেটে যাইতে না যাইতেই তাহারা আপন আপন কাজ সুরু করিয়া দিল। তেওয়ারির সঙ্গে রাম-বিরিজ্ দু'একদিন গাঁজা খাইয়া দেখিয়াছে—নেশা করিলেই যত দুঃখের কথা তাহার মনে পড়ে আর কান্না পায়। সেদিনও সে কান্না সুরু করিল। পরণের কাপড়টাকে গোকুলচন্দ্র মেয়েদের মত করিয়া পরিয়া, নাচিয়া নাচিয়া গান গাহিতে লাগিল: এলুমিনিয়ামের দু'টা ডেক্‌চি উপুড় করিয়া তেওয়ারি তাহাই ডুগি-তবলার মত গুম্ গুম্ করিয়া বাজাইতে লাগিল। গোবিন্দ বেচারা মদ খাইতে চায় নাই, কিন্তু এক তীর্থে আসিয়া পৃথক্ ফল হওয়া উচিত নয় বলিয়া সকলে মিলিয়া একরকম জোর করিয়াই তাহাকে খাওয়াইল।

নাচ গান ও কান্না তাহাদের কতক্ষণ চলিয়াছিল কে জানে। প্রত্যুষে তেওয়ারির ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখিল, মেঝের উপর যে যেখানে পারিয়াছে শুইয়া পড়িয়া সকলেই ঘুমাইতেছে। ঘরের দরজা খোলা। কাঁচের গ্লাস দুইটা ভাঙ্গিয়া গেছে,...বোতল ভাঙ্গিয়াছে. মাংসের কাঁটায় ঝোলে চারিদিক্ ছড়িচ্ছন্ন। তাড়াতাড়ি সে নিজের হাতেই সেগুলা পরিষ্কার করিয়া একে একে সকলকে উঠাইতে আরম্ভ করিল। গোঁ গোঁ করিয়া গোকুল উঠিল, রাম-বিরিজ উঠিল, কিন্তু গোবিন্দ কিছুতেই ওঠে না। আধখানা দেহ তাহার দরজার বাহিরে এবং বাকি আধখানা ঘরের ভিতর রাখিয়া উপুড় হইয়া সে শুইয়া আছে। বোধ করি রাত্রে সে ঘরের বাহিরে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া

আর ঘরের ভিতর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই, এইখানেই শুইয়া পড়িয়া নেশার ঝোঁকে বমি করিয়া ফেলিয়াছে। দুর্গন্ধে সেখানে দাঁড়ানো যায় না। অথচ তাড়াতাড়ি এসব পরিষ্কার করিয়া না ফেলিলে ডাক্তারবাবু টের পাইবেন। তেওয়ারি হাত দিয়া খুব জোরে জোরে নাড়িয়া গোবিন্দকে উঠাইতে লাগিল।

কিন্তু ঘুম তাহার কিছুতেই ভাঙ্গে না!

অবশেষে রাগিয়া সে তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া জোর করিয়া তাহাকে উল্টাইয়া দিয়া বলিল, 'ওঠ্!'

এবং 'ওঠ' বলিয়া গোবিন্দর মুখের পানে তাকাইবামাত্র তেওয়ারি চীৎকার করিয়া লাফাইয়া একেবারে ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

গোকুল ও রাম-বিরিজ্ তখনও বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছিল, তেওয়ারির চীৎকারে তাহারা চোখ মেলিয়া চাহিল।

ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তেওয়ারি বলিল, 'গোবিন্দ মরে' গেছে।'

নেশা ছুটিতে তাহাদের বিলম্ব হইল না। উঠিয়া গিয়া দেখিল, সত্যিই তাই। মুখে তাহার তখনও ভয়ের চিহ্ন। ঘোলাটে চোখ দুইটা যেন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে, দাঁতের পাশ দিয়া জিবটা বাহির হইয়া গেছে, নাক দিয়া খানিকটা রক্ত গড়াইয়া মুখে আসিয়া জমিয়াছে। সেদিক্ পানে তাকাইতেও ভয় করে।

ডাক্তারবাবু নীচে আসিয়া বসিয়া ছিলেন। ললিত মুখুজ্যে, সদানন্দ—দু'জনেই আসিয়াছিল।

চায়ের জন্য তাহারা অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় ছুটিয়া তেওয়ারি আসিয়া ঘরে ঢুকিল এবং ডাক্তারবাবুর পায়ের কাছে দড়াম্ করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, 'আর আমি এখানে থাকব না বাবু, আমায় ছুটি দিন।'

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন?'

তেওয়ারি উঠিয়া বসিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বলিল, 'গোবিন্দকে কাল ভূতে মেরে দিয়ে গেছে বাবু। আসুন —দেখবেন আসুন।'

উপস্থিত সকলেই চমকিয়া উঠিল। মুখুজ্যে জিজ্ঞাসা করিল, 'মেরে দিয়ে গেছে কি হে? একেবারে খুন! মরে গেছে?'

ঘাড় নাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তেওয়ারি বলিল, 'হ্যাঁ বাবু!'

ডাক্তারবাবু উঠিলেন, মুখুজ্যে উঠিল, সদানন্দ উঠিল; এবং সকলে মিলিযা ঘটনাস্থলে গিয়া দেখিল, গোবিন্দর মৃতদেহ তখনও তেমনি দরজার উপর কাঠ হইয়া পড়িয়া আছে।

কাহারও মুখে কোনও কথা নাই!

ডাক্তারবাবু অধোমুখে গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বুঝিলেন সবই। কিন্তু কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিলেন না। বহুক্ষণ তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর একজন কম্পাউণ্ডারকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, বাইক্ নিয়ে যাও, থানায় খবর দিয়ে এসো।'

গলার আওয়াজ তাঁহার ভারি বলিয়া বোধ হইল।

তেওয়ারি কি যেন বলিতে যাইতেছিল, ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'চুপ কর। তোমাদের সকলকে তাড়িয়ে দেব আমি। আবার নতুন লোক রাখব।'

সদানন্দ কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। এমন সুযোগ সে কোন-দিনই পায় নাই। বলিল, 'দিন্ না বাবু, লোকের ভাবনা কি। আমি আপনার রসুই করে দেবো।'

ডাক্তারবাবু তাহার মুখের পানে তাকাইলেন। বলিলেন, 'পারবে তুমি?'

সদানন্দ ঈষৎ হাসিয়া একবার মুখুজ্যের মুখের পানে তাকাইল; অর্থাৎ, তাহার সম্বন্ধে যাহা বলিতে হয় সে বলুক।

কিন্তু মুখুজ্যের বোধ করি হিংসা হইল। কিছুই সে বলিল না দেখিয়া সদানন্দ নিজেই বলিল, 'ভাত রাঁধার কাজই ত আমি করতাম বাবু, আজকাল চাকরি নেই, বসে আছি, বড় কষ্ট হচ্ছে।'

ডাক্তারবাবু তখন আর বেশী কথা বলিতে পারিলেন না। ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'বেশ থাকো তুমি আজ থেকেই।'

তেওয়ারি হাতজোড় করিয়া বলিল 'আমায় তাহ'লে ছুটি দিন বাবু, আমি আর এ ভতুড়ে বাড়ীতে থাকব না।'

গম্ভীর কণ্ঠে ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'এখন নয়। পুলিশের হাঙ্গামা চুকুক্ আগে। তারপর যেয়ো।'

পুলিশ!

পুলিশের নামে তেওয়ারির চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ডাক্তারবাবু সরকারি মানুষ। পুলিশের হাঙ্গামা দু'দিনেই চুকিয়া গেল।

আহা বেচারা গোবিন্দ।

তাহার আত্মীয়স্বজন কেহ কোথাও আছে কিনা জানিবার জন্য ডাক্তারবাবু অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোথাও কেহ সন্ধান দিতে পারিল না।

পুলিশের হাঙ্গামা চুকিলে ডাক্তারবাবু বলিয়াছিলেন, সকলকে তাড়াইয়া দিবেন, কিন্তু কাহাকেও তাড়ানো আর হইয়া ওঠে নাই।

তেওয়ারি নিজেই যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু দেখা গেল, যাইবার নামটি পর্য্যন্ত সে আর মুখেও আনে না! গোকুলও থাকিল, রাম-বিরিজও থাকিল। সদানন্দও কাজ করিতে লাগিল।

ডাক্তারবাবু কাহাকেও কিছু বলেন না। অনেক সময় চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া বোধ করি শুধু গোবিন্দর কথাই ভাবেন।

সেদিন তিনি সহরে যাইবার জন্য বাহির হইতেছেন, সদানন্দ হঠাৎ তাঁহার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ব্যাপার কি ?

সদানন্দ বলিল, 'বাড়ীতে আমার বড় গোলমাল চল্‌ছে হুজুর যদি বলেন ত' ওই রান্নাঘরের পাশের ঘরখানায় মেয়েছেলে নিয়ে আমি উঠে আসি।'

'বেশ ত', এসো।' বলিয়া ডাক্তারবাবু চলিয়া গেলেন এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, গ্রাম ছাড়িয়া দিয়া সদানন্দ সপরিবারে এখানে উঠিয়া আসিয়াছে।

রাত্রে তিনি খাইতে বসিয়া দেখিলেন, অন্য দিনের মত তেওয়ারি কিম্বা সদানন্দ কেহই তাঁহার খাবারের থালা লইয়া আসিল না। আসিল যে, তাহাকে তিনি তাঁহার জীবনে এই প্রথম দেখিতেছেন।

অসামান্যা সুন্দরী একটি মেয়ে—স্বাস্থ্যবতী, যুবতী, পরনে মাত্র একখানি সাদাসিধা শাড়ী,—হাতে দুটি শাখা ও সিঁথিতে সিঁদুর ছাড়া সর্ব্বাঙ্গে আভরণের কোথাও এতটুকু চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই।

খাবার নামাইয়া দিয়া মেয়েটি চলিয়া যাইতেছিল, পশ্চাতে হাসি-হাসি মুখে সদানন্দ আসিয়া দাঁড়াইল ; বলিল, 'আমার স্ত্রী।'

ডাক্তারবাবু মুখ তুলিয়া তাকাইলেন। বলিলেন, 'তোমার ছেলে-মেয়ে—?'

'আজ্ঞে না, ছেলেমেয়ে নেই।'

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'তাহ'লে কেন তুমি ওঁকে একলা এ বাড়ীতে নিয়ে এলে সদানন্দ? অন্যায় করলে।'

'আমি ত' আনতে চাইনি বাবু, ও নিজেই এলো।' বলিয়া সদানন্দ ডাক্তারবাবুর আর একটুখানি কাছে আগাইয়া গিয়া বলিল, 'একা নয় আজ্ঞে, ওর সঙ্গী আর একটি আছে।'

'কে?'

সদানন্দ বলিল, 'আমার প্রথম স্ত্রী। ইনি আমার দ্বিতীয় পক্ষের।'

কথাটা ডাক্তারবাবুর বোধ করি ভাল লাগিল না। সোফায় বসিয়া তিনি একখানা বই পড়িতেছিলেন, অস্ফুটস্বরে মাত্র একবার 'ও' বলিয়া তিনি আবার তাঁহার বইএর পাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

পরদিন দিনের বেলা ডাক্তারবাবু সহরে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা হইল। গ্রামপ্রান্তে বাগান এবং সেই বাড়ীটার উপর তখন অন্ধকার নামিয়াছে। নীচের ডিস্‌পেন্সারী ঘরের তালা বন্ধ

করিয়া কম্পাউণ্ডারেরা বাড়ী চলিয়া গেছে। কাহারও কোথাও সাড়াশব্দ নাই। প্রতিদিনের অভ্যাসমত অন্ধকারেই সিঁড়ি ধরিয়া ডাক্তারবাবু উপরে উঠিয়া গেলেন। ঘরে তখনও তাঁহার আলো দেওয়া হয় নাই। ভাবিলেন, সকলে মিলিয়া হয় ত রান্নাঘরে বসিয়া এখনও জটলা করিতেছে; গোকুল কিংবা রাম-বিরিজের নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে যাইবেন—হঠাৎ তাঁহার ঘরের মধ্যে খুট্ করিয়া কিসের যেন একটা আওয়াজ হইল। চমকিয়া তিনি সেই দিক পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। মনে হইল, আবছা অন্ধকারে কে যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সহসা ফস্ করিয়া একটা দিয়াশলাই জ্বলিল, দেখিতে দেখিতে টেবিলের উপর বাতিটা জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই আলোকে দেখিলেন, মায়া-পুরীর রাজকন্যার মত সদানন্দর স্ত্রী তাহার অপূর্ব্ব রূপরাশি লইয়া টেবিলের এক পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহারই মুখের পানে একাগ্র উন্মুখ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে।

ধীরে-ধীরে ডাক্তারবাবু ঘরে ঢুকিলেন। দেখিলেন, ঘরের যাবতীয় জিনিষপত্র আবার নূতন করিয়া সাজানো হইয়াছে,—দিব্য পরিপাটি, এ যেন বহুদিনের গোছানো সংসার!

কেমন যেন তাঁহার লজ্জা করিতে লাগিল। জামাটি খুলিয়া তিনি কোথায় রাখিবেন বুঝিতে পারিতেছিলেন না, মেয়েটি তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া হাত হইতে তাঁহার জামাটি একরকম কাড়িয়া লইল। পশ্চিম দিকের দেওয়ালে 'হুক্' টাঙ্গানো হইয়াছে, তাহারই উপর জামাটি টাঙ্গাইয়া দিয়া সে ষ্টোভ জ্বালিতে বসিল।

জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে ডাক্তারব্যবু বলিলেন, 'আপনি কেন, —চাকর-বাকরদের কাউকে ডেকে দিলেই ত' হ'তো।'

মেয়েটি ঈষৎ হাসিল।

সে বড় চমৎকার হাসি!

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'আপনি যান।'

কিন্তু সে কথা বোধ করি সে শুনিতেই পাইল না। ষ্টোভে তখন শব্দ উঠিতেছে, তাহারই উপর জল চড়াইয়া দিয়া চায়ের সাজ-সরঞ্জাম হাতের কাছে আনিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

'ট্রে'র উপর চা লইয়া মেয়েটি টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই ডাক্তারবাবু মুখ তুলিয়া তাহার মুখের পানে একবার তাকাইলেন। এত ভাল করিয়া তাহাকে দেখিবার অবসর তাঁহার আর হয় নাই। দেখিলেন, খোলা চুলের গোছা তাহার কাঁধের উপর, পিঠের উপর ছড়ানো, কপালে একটুখানি সিঁদূরের টিপ, হরিণীর মত দুটি আয়ত চক্ষু, কালো দুইটি স্বচ্ছ তারকা তাহারই মাঝখানে ঢল্‌ঢল্‌ করিতেছে, গায়ের রং যেন দুধে-আলতায় গোলা, সর্ব্বোপবি একখানি নীলাম্বরী শাড়ী তাহার সেই নিটোল সুন্দর দেহখানিকে বেষ্টন করিয়া কি গৌরব যে তাহাকে দান করিয়াছে তাহা আর বুঝাইয়া বলিবার নয়। দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্তি যেন আর কিছুতেই হয় না। অথচ এমন নির্লজ্জের মত তাকাইয়া থাকিতেও লজ্জা করে। ডাক্তারবাবু মুখ ফিরাইয়া চায়ের বাটিতে চুমুক দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার নাম?'

নারীর সঙ্গে পরিচয় জীবনে তাঁহার অত্যন্ত কম। চিরকালই তাহাদের সংস্রব হইতে নিজেকে তিনি দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন; কোথায় কখন্ কিরূপ ভাবে তাহাদের সহিত কথা কহিতে হয় তাহা তিনি জানেন না। বোধকরি নাম জিজ্ঞাসা করা তাঁহার উচিত হয় নাই।

মেয়েটি ঈষৎ হাসিয়া চোখ নামাইয়া বলিল, 'আরতি।'

আরতি! চমৎকার নাম!

কিন্তু এ-মেয়ের বিবাহ ওই অশিক্ষিত কুৎসিত সদানন্দর সঙ্গে হইল কেমন করিয়া—জানিবার জন্য ডাক্তারবাবুর মনে কৌতূহল অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল।

এ কৌতূহলই বা তাঁহার হয় কেন? মনের ইচ্ছা মনেই চাপিয়া রাখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, যান, আপনি নীচে যান। আমি আলো দেখিয়ে দিই।'

'আলো চাই না।' বলিয়া আরতি তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরিল এবং নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল!

একখানা বই লইয়া ডাক্তারবাবু সোফার উপর শুইয়া পড়িলেন। মনের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া শুধু আরতির কথাই জাগিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পিছনে শব্দ হইতেই তাকাইয়া দেখিলেন, খাবারের থালা হাতে লইয়া আরতি আবার তাঁহার ঘরে ঢুকিতেছে, এবং সুমুখে লণ্ঠন হাতে লইয়া সদানন্দ। দেওয়ালে টাঙ্গানো ঘড়িটার পানে তাকাইয়া দেখিলেন, তিন ঘণ্টা পার হইয়াছে, অথচ বইএ একটি পৃষ্ঠাও তখনও তাঁহার পড়া হয় নাই।

পরদিন সদানন্দর মুখে সবই শুনিলেন।

শুনিলেন, আরতির সঙ্গে বিবাহ তাহার মোটে তিন বৎসর হইয়াছে। পূর্ব্বদেশের কোন্ একটা সহরে সে না কি একবার চাকরি করিতে যায়। যে-বাড়ীতে সে ভাত রাঁধিত, তাহারই পাশের বাড়ীতে থাকিতেন আরতির মা। তিনিও না কি সে বাড়ীতে ঝি-এর কাজ

করিতেন। হঠাৎ একদিন শোনা গেল, আরতির মা মৃত্যুশয্যায় এবং তাঁহারই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বাড়ীর কর্ত্তা না কি তাঁহার বয়স্থা কন্যা আরতির বিবাহের আয়োজন করিয়াছেন। বি-এ পাশ করা একটি ছেলে না কি দয়া করিয়া তাহাকে বিবাহ করিবে। সেইদিনই বিবাহ সদানন্দ বিবাহ-সভায় উপস্থিত। অনাথা বিধবার মেয়ে, দয়া করিয়া তাহাদের কাজকর্ম্ম সে করিয়া দিতেছিল। বিবাহের লগ্ন উপস্থিত বর আর আসে না! শেষ মুহূর্ত্তে বর বলিয়া পাঠাইল—ও-মেয়েকে সে বিবাহ করিবে না, তাহার গোপন তথ্য সবই সে জানিয়া ফেলিয়াছে। সর্ব্বনাশ! বাড়ীর কর্ত্তা অস্থির হইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আরতির মা'র অবস্থা তখন এখন-যায় তখন-যায়। তাঁহাকে জানানো হইল না। অথচ সময় আর নাই। কোথাও কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া বুড়া কর্ত্তা-মহাশয় সদানন্দকে ধরিয়া বসিলেন— 'ব্রাহ্মণের মান-রক্ষা কর বাবা, তোমায় আমি নগদ পঞ্চাশটি টাকা দিচ্ছি। 'বাস্! তৎক্ষণাৎ বিবাহ! বিবাহের তিন দিন পরে মা মরিলেন। গোপন তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। ব্যাপার আর এমন বিশেষ কিছুই নয়। হঠাৎ একদিন রাত্রে কয়েকজন গুণ্ডা আসিয়া আরতিদের বাড়ী হইতে তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়া মুখে হাতে পায়ে কাপড় বাঁধিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া পথের মাঝে ফেলিয়া দেয়! চোর গুণ্ডা কেহই ধরা পড়ে নাই। জাতিচ্যুতা হইয়া আরতিকে লইয়া লোকলজ্জায় তাহার মা সে গ্রাম ছাড়িয়া দিয়া দূরের শহরে আসিয়া দাসীবৃত্তি আরম্ভ করেন। অনেক কষ্টে শেষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া ওই বৃদ্ধের বাড়ীতে আসিয়া একটুখানি নিরাপদ আশ্রয় পান।

আরতির জীবনের এই সামান্য ইতিহাস।

ডাক্তারবাবু শুনিয়া একটা দীর্ঘঃনিশ্বাস মোচন করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, 'খাবার আনব ?'

'হ্যাঁ আনো। কিন্তু নিজে এনো। ওঁকে আর বারবার কেন বিরক্ত করছ ?'

'যে আজ্ঞে।' বলিয়া সদানন্দ চলিয়া গেল বটে, কিন্তু খাবার আনিল আরতি।

রাত্রি নয় যে, আলো দেখাইয়া সদানন্দ সঙ্গে আসিবে।

খাবার ধরিয়া দিয়া আরতি বলিল, 'উঠুন।'

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'আপনি নিজে কেন বারবার—'

কথাটা আরতি তাঁহাকে শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'আমি কি আপনার 'আপনি' ?'

বলিয়া ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'আমি আপনার রাঁধুনী ব্রাহ্মণের স্ত্রী। 'আপনি' বললে আমার লজ্জা হয়।'

ডাক্তারবাবু এবার নিজেকে অত্যন্ত দৃঢ় করিয়া বলিয়া বসিলেন, 'লজ্জার কোনও প্রয়োজন নেই। দয়া করে' আপনি আর এখানে আসবেন না।'

আরতির গাল দুইটা হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল। মুখ চোখ যেন আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল। হেঁটমুখে শাড়ীর খানিকটা পাড় ধরিয়া সে দু'হাত দিয়া টানিতে টানিতে নিতান্ত সন্তর্পণে ধীরে-ধীরে সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল—এবং তাহার পর দুই দিন ডাক্তারবাবু তাহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। খাবার লইয়া কখনও-বা তেওয়ারি আসে, কখনও সদানন্দ।

গোধূলি-লগ্ন

আরতি আর আসে না।

এক-একবার মনে হয়, আরতির কথা কাহাকেও একবার জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু পরক্ষণেই মনের দুর্ব্বলতা মনেই চাপিয়া রাখিয়া ভাবেন, ভালই হইয়াছে।

দিন-কয়েক পরেই দেখেন ঘর্-দোর আবার সব আগেকার মতই বিশৃঙ্খল হইয়া গেছে। টেবিলের ধূলা ঝাড়া হয় না, আলোর কাঁচটা তেমন পরিষ্কার নাই, দোয়াতের কালি ফেলিয়া মেঝের কার্পেটটা সেদিন নিজেই তিনি নোংরা করিয়া ফেলিয়াছেন, ভাঙ্গা দোয়াতটা সেদিন হইতে ঘরের কোণে তেম্নি পড়িয়া আছে।

আগে হয় ত' ইহার জন্য কাহারও কাছে তিনি কোনও অভিযোগই করিতেন না, কিন্তু সেদিন হঠাৎ তাঁহার চোখে এ-সব বড় বিসদৃশ বোধ হইল। গোকুল ও রাম-বিরিজকে ডাকিয়া খুব খানিকটা তিরস্কার করিয়া দিলেন।

জোরে কথা বলিতে কেহ তাঁহাকে কখনও শোনে নাই। তাহারা ত' অবাক্!'

শহরে সেদিন একটা আত্মহত্যার মৃতদেহ 'ময়না' করিতে হইয়াছিল। সন্ধ্যায় যখন বাড়ী ফিরিলেন, ডাক্তারবাবুর মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। টেবিলের আলোটা গোকুল জ্বালিয়া দিয়া গেল। সাজ-পোষাক খুলিয়া ডাক্তারবাবু তাঁহার প্রতিদিনের অভ্যাসমত বই লইয়া পড়িতে বসিলেন। দু'এক পৃষ্ঠা পড়িতে না পড়িতেই দেখিলেন আলোর জ্যোতি কমিয়া আসিতেছে। আলোয় তেল নাই। ডাকিলেন, 'গোকুল! রাম-বিরিজ!'

জোরে জোরে কয়েকবার ডাকিবার পর রাম-বিরিজ আসিয়া দাঁড়াইল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'তোরা দূর হয়ে যা আমার বাড়ী থেকে।'

অপরাধের কথা কিছুই সে বুঝিতে পারিল না, হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময় কি যেন তাঁহাকে বলিবার জন্যে সদানন্দ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। ডাক্তারবাবু বলিলেন. 'কে সদানন্দ? আলোয় একটু তেল দাও ত' বাবা! আর এই চাকর দু'টোকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে কাল দু'টো নূতন চাকর ছাখো।'

সদানন্দ তৎক্ষণাৎ কেরোসিন তেলের বোতল আনিয়া আলোয় তেল পুরিয়া দিল। বলিল, 'আমি একটা বড় জরুরী কথা বলবার জন্যে আপনার কাছে এসেছিলাম।'

'কি কথা?'

সদানন্দ রাম-বিরিজের মুখের পানে একবার তাকাইল। কথাটা তাহার সুমুখে বলিতে বোধ করি ইতস্ততঃ করিতেছিল। ডাক্তারবাবু বুঝিলেন। তাই তিনি দরজার পাশে দণ্ডায়মান রাম-বিরিজের দিকে তাকাইয়া বলিলেন. 'দাঁড়িয়ে রইলি কেন হতভাগা? বেরো এখান থেকে! দূর হ'! মাইনে যা পাবি, যাবার সময় চেয়ে নিয়ে যাস্।'

রাম-বিরিজ চলিয়া গেলে সদানন্দ বলিল,—'তেওয়ারির জালায় ত' হুজুর আমায় এ বাড়ী ছাড়তে হলো।'

'কেন?'

সদানন্দ বলিল, 'একসঙ্গে কাজ করি, ভাবলাম বন্ধুলোক, বাড়ীর ভেতরে আসে আসুক, দোষটাই বা কি! কিন্তু ওর যে

এত গুণ তা কেমন করে' জানব বাবু, তাহ'লে ওকে বাড়ী ঢুকতে দিতাম না।

ডাক্তারবাবু সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

সদানন্দ বলিল, 'ব্যাটা দেখতাম, আমার ছোট বৌকে দেখলেই কেমন যেন করতে থাকে। বন্ধু-মানুষ, কি আর বলি বলুন, তখন আমি অতটা ভাবিনি। তারপর আজ সকালে—আমি রান্নাঘরে রান্না করছি, ছোট-বৌ আমার কাঁদতে কাঁদতে ছুটে' বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে আমায় বললে, 'তেওয়ারি আমার গায়ে হাত দিলে কেন জিজ্ঞেস কর।' তেওয়ারি তখন—'

ডাক্তারবাবু যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন, 'ডাকো তেওয়ারিকে।

তেওয়ারি আসিয়াই হাত জোড করিয়া বলিল, 'না হুজুর আমি কি কখনও—'

হাত তুলিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'চুপ কর।'

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি না ভুতুড়ে বাড়ী বলে' অনেক দিন আগেই যেতে চেয়েছিলে,—যাও নি কেন?'

তেওয়ারি বলিল, 'আপনার মত মনিব ছেড়ে কোথায়ই বা যাই বলুন?'

'বা' কথা শিখেছ ত' বেশ।' বলিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন 'যেখানে খুশী সেইখানে যাও। তোমার স্থান আর আমার এখানে নেই।'

কথাটাকে পরিহাস মনে করিয়া তেওয়ারি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাষ্ঠ হাসি হাসিতেছিল, ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'না হাসি নয়।'

বলিয়া চাবি দিয়া ড্রয়ার খুলিয়া দশটাকার পাঁচখানি নোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর নামাইয়া দিয়া বলিলেন, 'নাও। যতদিন না তোমার চাকরি-বাক্‌রি জোটে ততদিন এই দিয়ে চালিয়ো। কাল থেকে তোমায় যেন আর আমি এখানে দেখতে না পাই। বুঝলে ?'

অতগুলা টাকার মায়া ত্যাগ করা বড় সহজ কথা নয়। নোটগুলা হাত বাড়াইয়া লইবার সময় তেওয়ারির চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'দাঁড়াও।'

বলিয়াই তিনি সদানন্দের মুখের পানে তাকাইলেন। —'ডাকো তোমার স্ত্রীকে এইখানে। তেওয়ারি ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে যাক্।'

লণ্ঠন হাতে লইয়া সদানন্দ নীচে নামিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে একাকী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কিছুতেই এলো না বাবু। খালি খালি কাঁদছে। বললে, 'বল গিয়ে—আমি যাব না। ওকে আমি ক্ষমা করেছি।'

'বেশ, তাহ'লে তাঁকে আর ডেকে কাজ নেই।' বলিয়া একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তারবাবু তাঁহার সোফার উপর হেলান দিয়া ভাল করিয়া বসিয়া বলিলেন, 'যাও, তোমরা এখান থেকে।'

ডাক্তারবাবু বই পড়িতে পড়িতে সোফার উপরেই কোন্ সময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, শব্দ হইতেই আচমকা তাকাইয়া দেখেন, এক হাতে লণ্ঠন ও এক হাতে খাবারের থালা লইয়া বেচারা আরতি বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

কত দিন পরে সে আজ তাঁহার খাবার লইয়া উপরে আসিয়াছে।

ডাক্তারবাবু ঘুমাইয়া থাকিবার ভান করিয়া সোফার উপর শুইয়া শুইয়া দেখিতে লাগিলেন, অত্যন্ত সন্তর্পণে থালা নামাইয়া, লণ্ঠন নামাইয়া, হাত ধুইয়া আরতি আসন বিছাইয়া দিয়া, কুঁজো হইতে জল গড়াইতে বসিল। জল গড়ানোর বক্ বক্ শব্দ হইতেই সে জিব কাটিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল, ডাক্তারবাবুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল কিনা! কিন্তু জাগিয়া যে ঘুমায় তাহার ঘুম সহজে ভাঙ্গে না। জলের গ্লাসটি ধীরে ধীরে নামাইয়া দিয়া আরতি উঠিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, এইবার সে দরজার কাছে গিয়া দুম-দাম করিয়া খুব জোরে খানিকটা শব্দ করিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইবে।—লণ্ঠনটি হাতে লইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সে কি তাহার পলাইবার ভঙ্গী!

ডাক্তারবাবু আর না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। হাসিতে হাসিতে উঠিয়া বসিতেই সহসা অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া আরতি টেবিলের এপাশে একেবারে তাঁহার মুখোমুখি থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'চোর চোর বলে' যদি ঘুমের ঘোরে চীৎকার করে' উঠতাম?'

আরতি হাসিল। বলিল, 'আপনি মিথ্যাবাদী হতেন, কেউ বিশ্বাস করতো না।'

ডাক্তারবাবুও হাসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তেওয়ারি চলে গেছে?'

লজ্জায় আরতির মুখখানা কেমন যেন হইয়া গেল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ'।

'কাল যে ডাকতে পাঠালাম, এলে না কেন?'

আরতিকে এই তাঁহার প্রথম 'তুমি' সম্বোধন। হয় ত বা ভুলিয়াই বলিয়াছেন।

আরতি তাঁহার মুখের পানে একবার তাকাইল। বলিল, 'যাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় ফিরে আসতে তার লজ্জা করে।'

'তাড়িয়ে ত' দিই নি।'

'তাহ'লে আপনি মিথ্যাবাদী।'

বলিয়া একটি চঞ্চল বালিকার মত চোখে মুখে সলজ্জ একটুখানি মধুর হাসি হাসিয়া আরতি সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল।

ডাক্তারবাবুর চোখের সুমুখে যেন একটা বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিলেন,—

'শোনো আরতি! শোন!'

আরতির পদশব্দ তখন সিঁড়ির নীচে মিলাইয়া গেছে। তাঁহার নিজেরই কণ্ঠস্বর সেই নিস্তব্ধ নিশীথে সেই নির্জন কক্ষের মধ্যে তাঁহার নিজেরই বুকের উপর আবার যেন ফিরিয়া আসিয়া ধ্বক করিয়া বাজিল। এ আহ্বান যদি আর কেহ শুনিতে পায়। ছি, ছি, নিজের দুর্ব্বলতায় নিজেই তিনি নিরতিশয় লজ্জিত হইয়া উঠিলেন।

শহর হইতে ফিরিয়া আসিয়া ডাক্তারবাবু প্রত্যহই লক্ষ্য করেন, ঘরের জিনিষপত্র তাঁহার আবার ঠিক আগেকার মতই গোছালো হইয়া উঠিয়াছে। হাতের কাছে কোনও জিনিষের প্রয়োজন হইলে তাহা তিনি ঠিক হাতের কাছেই পান, কোন-কিছুর জন্য তাঁহাকে আর ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে হয় না।

কে যে এ-সব ঠিক করিয়া রাখে তাহা তিনি জানেন। একবারটি

তাহাকে দেখিবার জন্য, তাহার সঙ্গে কথা বলিবার জন্য মন তাঁহার মাঝে-মাঝে বিদ্রোহী হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার দেখা মেলা ভার। অলক্ষ্যে থাকিয়াই সে তাহার কাজকর্ম্ম করিয়া যায়।

আরতি আর ডাক্তারবাবুর চোখের সুমুখে কোন দিনই আসে না। যদি-বা কোনো দিন হঠাৎ হয় ত সিঁড়ির বাঁকে, কিম্বা হয় ত' ঘরের কোণে চোখাচোখি হইয়া যায়, ত' সে ছুটিয়া তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে পলায়ন করে।

ডাক্তারবাবু সেদিন তাঁহার পকেট হইতে রুমাল বাহির করিতে গিয়া দেখেন, রুমালের কোণে তাঁহার নামের প্রথম ইংরেজি অক্ষরটি রঙিন সূতা দিয়া লিখিয়া রাখা হইয়াছে, সার্টের প্রায় অধিকাংশ বোতাম ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, দেখেন, সেগুলো আবার নূতন করিয়া কে যেন বসাইয়া রাখিয়াছে।

মন্দ লাগে না। কিন্তু কোথায় যেন কিসের গ্লানি তাঁহার বুকের ভিতর কাঁটার মত খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতে থাকে।

মনে হয় কিসের দুর্ব্বলতা। যাহাকে তিনি এতদিন জয় করিয়া আসিয়াছেন, আজ যদি আবার তাহারই কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে হয় ত' তাঁহার লজ্জার আর বাকি কিছু থাকিবে না।

গ্রামের ললিত মুখুজ্যে এখনও আসে। তবে তাহার কম্পাউণ্ডারীর আশা সে এখন একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছে।

রোগী দেখিবার আগে প্রত্যহ সকালে ডাক্তারবাবু নীচের যে ঘরখানায় আসিয়া বসেন, দেখেন, তাহারই এক কোণে একটি চেয়ারের উপর মুখুজ্যে চুপ করিয়া বসিয়া চা খাইতেছে।

ডাক্তারবাবুকে দেখিবামাত্র একগাল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে,—'কি রকম? ভূতের ভয়-টয় আর—'

ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া ডাক্তারবাবু বলেন, 'না।'

কিন্তু এই 'না' বলা মুখুজ্যের ভাল লাগে না। এত বড় ভুতুড়ে' বাড়ী—অন্ধকার নামিলে তাহার ত্রিসীমানায় মানুষ আসিতে পারে না—সেই বাড়ীতে দিবারাত্রি যাহারা বাস করিতেছে তাহারা এতটুকু ভয় পায় না—সে কথা সে বিশ্বাস করে কেমন করিয়া। ভূত ত' এ বাড়ীর আনাচে-কানাচে আছেই, তাহার উপর গোবিন্দ চাকরটা মরিয়াছে। ভয় ইহারা নিশ্চয়ই পায়—লোকের কাছে বলে না।

সে যাই হোক, ডাক্তারবাবু তেওয়ারিকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, এবং তাহার জন্য ডাক্তারবাবুর নামে যে-অপবাদ সে সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে, সে কথা ডাক্তারবাবুকে বলা প্রয়োজন। কিন্তু কথাটা সে কোনো প্রকারেই জানাইতে পারিতেছিল না।

অবশেষে ডাক্তারবাবু নিজেই তাহার ব্যবস্থা করিলেন। বোধ করি কথা খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, তাই মুখুজ্যেকে তিনি একসময় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, 'আচ্ছা, আপনাদের গ্রামের লোক সদানন্দকে কিছু বলে না—আমার এখানে এসে থাকবার জন্যে? আমি ত' ক্রিশ্চান।'

'হ্যাঁ, বলে না আবার!' বলিয়া চায়ের পেয়ালাটা হাত হইতে নামাইয়া মুখুজ্যে বলিল, 'সেদিন ত' এক মজলিস ডাকিয়ে গ্রামের লোক ওকে পতিত করে' দিয়েছে, শোনেন নি সে কথা?'

'তাই না কি?'—ডাক্তারবাবু একটুখানি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

মুখুজ্যে থামিল না। বলিল, 'তেওয়ারিকে আপনার ছাড়িয়ে দেওয়া উচিত হয়নি। সে আপনার ভারি নিন্দে করে' বেড়াচ্ছে।'

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি রকম?'

'না। সে আর আপনার শুনে কাজ নেই। কানে আঙুল দিতে হয়।'

এই বলিয়া ললিত মুখুজ্যে না বলিবার ভান করিয়া পকেট হইতে একটি বিড়ি বাহির করিয়া দিয়াশলাই দিয়া জ্বালাইয়া নির্বিকার চিত্তে তাহাই সে টানিতে লাগিল।

জানিবার আগ্রহ হওয়া ডাক্তারবাবুর পক্ষে স্বাভাবিক। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বলুন না, বলতে দোষ কি?'

মুখুজ্যে একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া চাপা-গলায় বলিল, 'হারামজাদা বলে কি না—সদানন্দ এবার ডাক্তারবাবুর বাড়ীতেই চিরকাল রয়ে গেল।'—'কেন?' বলে, 'জানোনা নাকি? ডাক্তারবাবু বিয়ে-থা করেন নি, আর ওর ছোট বৌটি দেখতে-শুনতেও বেশ। দু'জনের আজকাল...'

ডাক্তারবাবু উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছিলেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন 'থাক্।'

মুখুজ্যে চুপ করিয়া নেবানো বিড়িটা আবার ধরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ডাক্তারবাবুর মুখখানা তখন রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। ধীরে-ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কিছু না বলিয়াই তিনি দ্রুতপদে রুগী দেখিবার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

সেদিনও তাঁহাকে শহরে যাইতে হইয়াছিল।

ফিরিতে রাত্রি হইল। উপরে উঠিবার আগেই তিনি সিঁড়ির কাছ হইতে ডাকিলেন, 'সদানন্দ!'

সদানন্দ তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'আজ্ঞে।'

'এসো আমার সঙ্গে।' বলিয়া সদানন্দকে তিনি সঙ্গে করিয়া উপরের ঘরে লইয়া আসিলেন।

বলিলেন, 'সদানন্দ, বোসো।'

কোথায়-বা বসিবে! একটা চেয়ারের গায় হাত দিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া বলিল, 'বসুন, আমি বেশ আছি।'

ডাক্তারবাবু কি যে বলিবেন বুঝিতে পারিতেছিলেন না। একবার জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, একবার ঘরের মাঝখানে আসিলেন, একবার এদিকে গেলেন, একবার ওদিকে গেলেন, এবং শেষে প্রায় মিনিট-পাঁচেক পরে সোফার কাছে আসিয়া তেমনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই বলিলেন, 'আচ্ছা সদানন্দ, —এত যে 'কলিয়ারী' রয়েছে, এখানে একটি চাকরি পাওয়া যায় না?'

সদানন্দ কথাটা ভাল বুঝিতে পারিল না; বলিল, 'আজ্ঞে, কিসের চাকরি?'

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'তোমার।'

সদানন্দ সত্যই ভীত হইয়া উঠিল। বলিল, 'কেন হুজুর আমায় কি আপনি ছাড়িয়ে দেবেন?'

অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে চোখ বুজিয়া তিনি ঘাড় নাড়িলেন; বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

বলিয়াই একটুখানি থামিয়া তিনি আবার আরম্ভ করিলেন, 'গ্রামে ত' তোমার ঘর-বাড়ী আছে, সেইখানেই এখন তোমার স্ত্রীদের—'

বাধা দিয়া সদানন্দ বলিয়া উঠিল, 'চালে যে খড় নেই হুজুর, নইলে আর এখানে এলাম কেন ?'

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'খড় ? কত টাকার খড় লাগবে ?'

'তা আজ্ঞে পনর-কুড়ি, টাকার। কিন্তু আমি···আমি কি হুজুরের কাছে দোষ-অপরাধ কিছু···

বলিতে বলিতে গলাটা তাহার ধরিয়া আসিল।

ডাক্তারবাবুও কথা বলিতে পারিতেছিলেন না। জোর করিয়া ঘাড় নাড়িয়া 'না' বলিয়া তিনি তাহার পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া দেরাজ্‌টা খুলিলেন এবং দশ-টাকার দশখানা নোট হাতে লইয়া সদানন্দের হাতের কাছে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'ধরো।'

কম্পিত হস্তে সদানন্দ তাহা গ্রহণ করিল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'চাকরি যতদিন না পাও, টাকার দরকার হলেই আমার কাছে এসে নিয়ে যেয়ো।'

এই বলিয়া ডাক্তারবাবু সেখানে আর অপেক্ষা করিলেন না, কাপড় জামা ছাড়িবার জন্য পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

পরদিন সকালে রোগী দেখা শেষ করিয়া ডাক্তারবাবু উপরে উঠিয়া যাইতেছেন, সিঁড়ির পাশে দাঁড়াইয়া গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার খাবার ?'

অন্যমনস্কের মত ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'হুঁ কি বল্‌লি ?'

গোকুল আবার জিজ্ঞসা করিল, 'আপনার খাবার কি এক্ষুণি আনব ?'

'খাবার কোথায় পেলি ? সদানন্দ যায় নি ?'

বলিতে বলিতে তিনি তাঁহার ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন।

গোকুলও পিছু-পিছু আসিয়া বলিল, রাত থাকতে উঠে' রান্না করে' দিয়ে গেছে। ও-বেলা থেকে আমায় রান্না করতে বলে' গেছে।'

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই জানিস্ রাঁধতে ?'

সলজ্জ একটুখানি হাসিয়া গোকুল বলিল, 'জানি।'

বলিয়াই হঠাৎ তাহার কি মনে হইল, বলিল, 'যাবার সময় সদানন্দর ছোট-বৌটা খুব কাঁদছিল।'

'কেন ?'

গোকুল বলিল, 'সদানন্দ একটা ছড়ি দিয়ে তাকে এমন মার মারলে—!'

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন বল্ দেখি ?'

গোকুল বলিল, 'জিজ্ঞেস্ করলাম, তা কিছুতেই বললে না। মারলে তাই দেখলাম।'

ডাক্তারবাবু স্নানের ঘরে চলিয়া যাইতেছিলেন, গোকুল আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'আনব খাবার ?'

ডাক্তারবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'না।'

সাজ-পোষাক পরিয়া না খাইয়াই তিনি শহরে চলিয়া যাইতেছিলেন, ভাবিলেন, অন্যায় হইবে, চাকরেরাও হয় ত তাহা হইলে নানা প্রকার সন্দেহ করিতে পারে, অথচ খাইবার ইচ্ছা তাঁহার একেবারেই নাই। ডাকিলেন, 'গোকুল!'

'আজ্ঞে !'

'নিয়ে আয় খাবার।'

ভূতুড়ে বাড়ী আবার খাঁ খাঁ করিতে থাকে।

গোকুল ও রাম-বিরিজ্—দু'জনকেই সব কাজ করিতে হয়। দিনের বেলা গোকুল হয় ত' রান্না করে, রামবিরিজ্ ঝাঁটা হাতে লইয়া উপরের ঘর পরিষ্কার করিতে যায়। কিন্তু সন্ধ্যার পর, তাহাদের আর ছাড়াছাড়ি হয় না। ঘরের বাহির হইতে হইলে একজন আর-একজনের গা ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া চলে।

ডাক্তারবাবু কোনো দিন শহরে যান, কোনো দিন যান না। কোনোদিন খান, কোনো দিন-বা না খাইয়াই ঘুমাইয়া পড়েন। গোকুল কিংবা রামবিরিজ্ ডাকিয়া তুলিতে গেলে বলেন, 'শরীর ভাল নেই।'

ঘর-দোর আবার তেমনি অপরিষ্কার অগোছালো হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আগে যদি বা বলিতেন, এখন আর কাহাকেও কিছু বলিবার প্রবৃত্তি নাই—কোনো রকমে দিন চলিয়া যাওয়া মাত্র।

সকালে ললিত মুখুজ্যে আসে। সেদিন আসিয়া বলিল, 'বড় ভাল কাজ করেছেন মশাই তাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে।'

'কাদের ?'

মুখুজ্যে হাসিয়া বলিল, 'কাদের আবার? সদানন্দকে আর ওর সেই ছুঁড়ী বৌটাকে। বেশ করেছেন।'

ডাক্তারবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।'

মুখুজ্যে বলিল, 'শুনলাম না কি শ'পাঁচেক টাকাও দিয়েছেন

ওদের। তা বেশ করেছেন। আপনার মত এত বড় একটা জেণ্টোমেণ্টো মানুষ—আমরা যে কথা কইতে পাই এই যথেষ্ট, —নিজের মানটা ত' বাঁচাতে হবে। বেশ করেছেন।'

ডাক্তারবাবু এবার উঠিতে যাইতেছিলেন, মুখুজ্যে আবার বলিল, 'শুনেছেন, তেওয়ারির সঙ্গে গিয়ে আবার মিলেছে ব্যাটা! দু'জনেই চাকরি পেয়েছে এক জায়গায়। কলিয়ারীতে বেশ রয়েছে দু'জনে। বৌটাকেও নিয়ে গিয়েছে সেইখানে।'

ডাক্তারবাবু এবার সত্যই উঠিলেন। বলিলেন, 'আসি। আমার একটু কাজ আছে।'

কাজ কিন্তু সত্যই ছিল না। দোতালায় উঠিয়া গিয়া তাঁহার সেই ঘরখানির পাশে ছোট যে বারান্দাটুকু ছিল, তাহারই উপর একটি 'ডেক-চেয়ারে' তিনি শুইয়া পড়িলেন। সম্মুখে উন্মুক্ত পল্লী-প্রান্তর। বহুদূরে কয়লাকুঠির একটা চিমনি দেখা যাইতেছে। তাহারই ধোঁয়ায় আকাশটা যেন কালো হইয়া গেছে। একদৃষ্টে তিনি সেইদিক পানে তাকাইয়া রহিলেন। চৈত্র মাস। রিক্তপত্র বৃক্ষশাখায় বসিয়া একটা কাক ডাকিতেছে। বাহিরে রৌদ্র ইহারই মধ্যে প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখে রৌদ্র দগ্ধ অসমতল প্রান্তর, দূরে একটি পুকুরের পাড়ে কতকগুলা তালের গাছ, মাথা তুলিয়া যেন আকাশ স্পর্শ করিতে চায়। দিগন্ত-বিস্তৃত ওই বন্ধ্যা প্রান্তরের মতই তাঁহারও বুকের ভিতরটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। ডাক্তারবাবু একবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একবার ঘরের ভিতর গিয়া খানিকটা পায়চারি করিয়া আসিলেন। কিন্তু কিছুই যেন তাঁহার আজ আর ভাল লাগে না। সামান্য একটি নারীর জন্য আজ যে তাঁহার এই অবস্থা—সে কথা কোনো

প্রকারেই তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। মনে হইল, ইহাই হয় ত তাঁহার বার্দ্ধক্যের লক্ষণ। এবং সেই জন্যই বুঝি এই ঔদাসীন্য তাঁহাকে ধীরে ধীরে ধরিয়া বসিতেছে। ইহাকে জয় করিতে হইবে।

শহরে সেদিন কোনো কাজ ছিল না, তবু তিনি শহরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া গোকুলকে ডাকিয়া খাবার দিতে বলিলেন।

দিন দুই পরে ডাক্তারবাবু হঠাৎ সেদিন একটা স্বপ্ন দেখিলেন সকালে উঠিয়া মনটা তাঁহার কেমন যেন ভারি-ভারি বোধ হইতে লাগিল। সারারাত্রি ধরিয়া তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন। স্বপ্নটা আবছা আবছা তাঁহার মনে আছে। মনে আছে—আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। কোথাও যেন কোন্ পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়, শালের জঙ্গল, ফুলের গাছ, এবং তাহারই মাঝখানে অনেকগুলি পাতার কুটীর। তাহারই একটিতে যেন তিনি নিজে বাস করিতেছেন। দূরে একটি ছোট্ট নদী হইতে তাহাদের জল আনিতে হয়। তখন বর্ষাকাল। পরিপূর্ণতার শেষ রেখা পর্য্যন্ত নদী তখন ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহারই সেই আত্মহারা উদ্দাম চঞ্চল স্রোতের মাঝখানে হঠাৎ একটি মেয়ে সেদিন জল লইতে আসিয়া ভাসিয়া গেল। ডাক্তারবাবু তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিলেন। বহুক্ষণ দু'জনে সাঁতার কাটিয়া ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া যখন তীরে উঠিলেন, দেখিলেন, মেয়েটি আর কেহ নয়,—আরতি।—'তুমি এখানে?' মৃদু হাসিয়া আরতি বলিল, 'তোমারই জন্যে।' আরতি হাঁটিতে পারিতেছিল না। ডাক্তারবাবু তাহাকে বুকের উপর তুলিয়া ধরিয়া তাঁহার সেই পাতার কুটীরে লইয়া আসিয়া বলিলেন, 'তোমায়

আর যেতে দেব না কিন্তু।' আরতি বলিল, 'লোকে কি বল্‌বে?' ডাক্তারবাবু তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন; বলিলেন, 'বলুক।'

স্বপ্নে যেন তিনি আরও কি কি দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সে-সব কথা তাঁহার আর মনে নাই। শুধু মনে হইল, আরতির স্পর্শ যেন এখনও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে লাগিয়া আছে।

অথচ ইহা অন্যায়, ইহা অপরাধ, ইহা পাপ।

সারাদিন ধরিয়া এই স্বপ্নের কথা সেদিন তিনি তাঁহার মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, কোনও দুর্ব্বলতাকেই আর তিনি তাঁহার মনে স্থান দিবেন না। তাঁহাকে শক্ত হইতে হইবে।

কিন্তু পরদিন আবার···

আবার সেই স্বপ্ন!

এবার আর সে পার্ব্বত্য প্রদেশ নয়। এবার মনে হইল যেন কোন্ শহরের একটা প্রকাণ্ড বাড়ীতে দাস-দাসী পরিবৃত হইয়া বৃহৎ একটি পরিবারের মধ্যে আরতি বাস করিতেছে। তিনি যেন সেই শহরের ডাক্তার। রোগী দেখিতে গিয়া দেখিলেন, রোগশয্যায় আরতি শুইয়া আছে, বিছানার উপর ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বলিতেছে, 'আমায় বাঁচাও।'

প্রভাতে সেদিন শয্যাত্যাগ করিয়া মনটা তাঁহার খারাপ হইয়া গেল। মশারির ভিতরেই চুপ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল,—তাহার সেই আর্ত্ত চীৎকার এখনও যেন তাঁহার কাণে আসিয়া বাজিতেছে—'আমায় বাঁচাও! আমায় বাঁচাও!'

কেমন আছে কে জানে! হইতেও পারে বা :হয় ত তাহার অসুখ করিয়াছে।

কিন্তু সে যাই হোক, পরদিন তিনি রাত্রে আর কিছু খাইলেন না। ভাবিলেন, উপবাস দিলে হয় ত' তিনি এ স্বপ্নের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিবেন। শুইবার আগে হাত পা মুখ চোখ ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিলেন। শয়নের পূর্ব্বে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া চোখ বুজিতেই কখন যে তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন বুঝিতেও পারেন নাই।

সকালে উঠিলেন। সেরাত্রে তাঁহার ঘুম হইয়াছে চমৎকার! অনেক করিয়া স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্বপ্ন সেদিন তিনি দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না।

ডাক্তারবাবু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

পাঁচ দিন তিনি আর কোনও স্বপ্ন দেখেন নাই।

কিন্তু এই পাঁচটি দিন ধরিয়া সমস্ত কাজকর্ম্মের মধ্যে তিনি শুধু সেই স্বপ্নের কথাই ভাবিয়াছেন। ভাবিয়াছেন, মনে তাঁহার কোনও সুখ নাই, শান্তি নাই, বিশ্রাম নাই—তীব্র তাপিত মরুভূমির মত সমস্ত অন্তঃকরণ তাঁহার যেন শুধু এক অতৃপ্ত পিপাসার আকণ্ঠ জ্বালা লইয়া দিবারাত্রি জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে।

মনে হইল, স্বপ্নে যেন তাঁহার সুখ ছিল, শান্তি ছিল, তৃপ্তি ছিল। নীরব নিস্তব্ধ নির্জ্জন নিশীথে, লোকচক্ষুর অগোচরে একান্ত সন্তর্পণে যে গোপন অভিসারিকা নিঃশব্দ পদক্ষেপে তাঁহার নিদ্রিত মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহারই অবচেতন অন্তস্তলের কোন্ গভীর গুপ্ত প্রদেশে

এতটুকু একটি মৃদু করস্পর্শ রাখিয়া চলিয়া যাইত, এমন করিয়া তাহাকে চিরনির্ব্বাসিত করিবার কি প্রয়োজন যে তাঁহার ছিল, কে জানে!

আবার তাহাকে তিনি তেম্‌নি করিয়াই ফিরিয়া পাইতে চান!

স্বপ্নে আবার তিনি তাহাকেই দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু স্বপ্ন যেন আর কিছুতেই আসে না। মনে হয়, অভিমান করিয়া সে অভিমানিনী যেন তাঁহাকে ছাড়িয়া চিরদিনের জন্য পলায়ন করিয়াছে।

উপবাস দিয়া, শয়নের পূর্ব্বে স্নান করিয়া অতি কষ্টে যে স্বপ্ন তিনি নিবারণ করিয়াছিলেন, আজ আবার তাহারই প্রতীক্ষায় মন তাঁহার উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল।

রাত্রে আবার তিনি আহার সুরু করিলেন। সকালে রোগী বিদায় করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, কোনো কাজেই তাঁহার গা লাগে না।

শহর হইতে আজকাল সকাল-সকাল ফিরিয়া প্রায়ই তিনি দোতালার বারান্দায় গিয়া বসেন। বৈশাখের অপরাহ্ন। কোনো দিন বা কাল-বৈশাখীর কালো মেঘ ঘনঘোর করিয়া পশ্চিমের আকাশ ছাইয়া ধীরে ধীরে সমস্ত আকাশটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফলে, আবার কোনো দিন বা নির্মেঘ নির্ম্মুক্ত আকাশপ্রান্তে নীলাঞ্জনবর্ণ বনরেখার মাথার উপরে শান্ত সমাহিত সূর্য্যাস্ত দেখা যায়—বিচিত্র বর্ণে আকাশ রঞ্জিত হইয়া ওঠে, বাতাসে কিসের

যেন মাদকতা ভাসিয়া আসে ;—দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা নামে, আকাশে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত চাঁদ দেখা দেয়, —এবং সেই জনশূন্য গৃহের মধ্যে দিগন্ত-প্রসারিত সেই জ্যোৎস্নালোকে বসিয়া ডাক্তারবাবুর বুকের ভিতরটা কেমন যেন তোলপাড় করিতে থাকে ;—এই স্নেহ-হীন বন্ধুহীন বৈচিত্র্যহীন একাকী নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রা তাঁহার কাছে ধীরে-ধীরে যেন অসহ্য হইয়া ওঠে।

সেদিন এমনি বসিয়া আছেন। রবিবার। সূর্য্যাস্ত তখনও হয় নাই। চোখের সুমুখে কয়লা-কুঠির প্রকাণ্ড একটা চিম্‌নির মাথায় ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশ স্পর্শ করিতেছিল। তাহাই তিনি একাগ্র উন্মুখ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। হঠাৎ কোথায় যেন বাতাস বন্ধ হইয়া গিয়া চারিদিক গুমোট্ করিয়া উঠিল। পশ্চিম আকাশে কাল-বৈশাখীর কয়েক খণ্ড কালো মেঘ দেখা গেল। হয় ত বা বৃষ্টি নামিবে।

নামুক্ বৃষ্টি। ডাক্তারবাবু সেখান হইতে নড়িলেন না।

সহসা মনে হইল, মেঘ কাটিয়া গিয়া কোথায় যেন ঝড় উঠিয়াছে। ভীষণ একটা ঝড়ের গর্জ্জন কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল। দূর প্রান্তরে ঘূর্ণিবায়ু ঘুরিয়া ঘুরিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে আকাশ বাতাস সব যেন ধূলায় ধূসর হইয়া গেল। ধূলি-ধূসরিত গাছের পাতা, ধূলাবালি উড়িয়া উড়িয়া গায়ে আসিয়া লাগিল। চোখ চাহিয়া সেখানে আর বসিয়া থাকা যায় না। ডাক্তারবাবু উঠিতে যাইবেন, প্রবল বাতাসের বেগে খড়-কুটার সঙ্গে হঠাৎ একটা সাদা কাগজ উড়িয়া আসিয়া তাঁহার গায়ে লাগিতেই কি যে কৌতূহল হইল কে জানে, হাত দিয়া

সেটা তিনি ধরিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, সাদা একটা কাগজের গায়ে টক্‌টকে খানিকটা কাঁচা রক্ত লাগিয়া আছে। শিহরিয়া উঠিয়া সেটা তিনি নীচে ফেলিয়া দিতে গেলেন, কিন্তু যতবার ফেলিবার চেষ্টা করিলেন, ততবারই সেটা উড়িয়া উড়িয়া তাহার গায়ে আসিয়া লাগিতে লাগিল।

রাত্রে সেদিন তিনি তাঁহার বহু দিনের বাঞ্ছিত স্বপ্ন আবার দেখিলেন।

দেখিলেন, কোথায় যেন কোন্ একটা অপরিচিত রাস্তার পাশ দিয়া তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছেন। পথের মাঝে হঠাৎ ঝড় উঠিল, ঘোড়া আর চলিতে পারে না। পথের ধারে ছোট একটা ঘরের দরজায় ঘোড়া থামাইয়া তাড়াতাড়ি আশ্রয় লইবার জন্য সেইখানেই তিনি ঢুকিয়া পড়িলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখেন, আলো জ্বলিতেছে; এবং সেই ক্ষীণালোকিত গৃহের ঠিক মাঝখানে তালপাতার একটা চাটাই বিছাইয়া কতকগুলা লোক মদ খাইয়া হল্লা করিতেছে। তিনি ঘরে ঢুকিতেই হল্লা তাহাদের মুহূর্ত্তের জন্য থামিল। এবং তৎক্ষণাৎ সবিস্ময়ে দেখিলেন, পাশের দরজা দিয়া কৃষ্ণদীপ্ত-নয়না গৌরাঙ্গী কৃশতনু পরমাসুন্দরী এক যুবতী সবুজ রঙের ঘাঘরা ঘুরাইয়া, বাসন্তী রঙের ওড়না উড়াইয়া নৃত্য-চপল ভঙ্গীতে হেলিয়া দুলিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল। আসিবামাত্র কোথা হইতে যেন যাদুবিদ্যার মত চারিদিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল, সঙ্গীত সুরু হইল এবং নূপুরের শব্দে গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া সেই রূপলাবণ্যবতী যুবতী সকলের হাতে হাতে সুরাপাত্র বিতরণ করিতে লাগিল।

মেয়েটি ডাক্তারবাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি ঘাড় নাড়িয়া তাঁহার অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

চারিদিকে হো হো করিয়া একটা হাসির শব্দ উঠিল।

ডাক্তারবাবু দেখিলেন, মেয়েটি তাহার স্খলিত দুই বাহু দিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া হাসিতেছে। এতক্ষণ ভাল করিয়া তিনি তাহাকে দেখিতে পান নাই; মুখের পানে তাকাইতে লজ্জা করিতেছিল; কিন্তু সেইবার তাহাকে একান্ত সন্নিকটে পাইয়া প্রথমে তাহার সেই অলসবিন্যস্ত বাহুর দিকে, পরে তাহার সেই উৎক্ষিপ্ত বঙ্কিম কণ্ঠ রেখার দিকে, পরে তাহার সেই বিস্তৃতপক্ষ প্রদীপ্ত কৃষ্ণ-চঞ্চল দু'টি চক্ষু-তারকার দিকে নিরতিশয় নিস্তব্ধ একাগ্রতার সহিত বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে গিয়া সহসা চমকিয়া শিহরিয়া উঠিলেন—'তুমি! তুমি! আরতি! তুমি এখানে?'

আরতি মুখে কোনও কথা বলিল না; ঈষৎ হাসিয়া শুধু সে তাঁহার দুটি আতপ্ত ওষ্ঠপুটে নিজের দুটি সুচারু আরক্তিম ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া আনন্দিত মুখে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেই ডাক্তারবাবুও চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

এমন সময় ভীষণ একটা শব্দে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। দেখিলেন, সর্ব্বনাশ! আরতির মাথার উপর সজোরে একটা বোতল ভাঙ্গিয়া দিয়া কে একটা লোক যেন তাঁহার চোখের সুমুখ দিয়া ছুটিয়া পলাইল। ঘরের মধ্যে হৈ হৈ একটা চীৎকার উঠিল। আরতির মাথাটা কাটিয়া গিয়া রক্তের ফোয়ারায় ডাক্তারবাবুর সর্ব্বাঙ্গ তখন ভিজিয়া যাইতেছে। মর্ম্মভেদী একটা আর্ত্ত চীৎকার করিয়া আরতি তাঁহার হাতের উপরেই

লুটাইয়া পড়িল। ডাক্তারবাবু হায় হায় করিয়া উঠিলেন। চারিদিকে লোক জড়ো হইয়া গেল। সদানন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল। ডাক্তারবাবু বসিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারই কোলে মাথা রাখিয়া আরতি অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে কহিল, 'চললাম। আবার যেন দেখা হয়।' বলিয়া সে তাহার ঘোলাটে চক্ষু স্থির করিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতেই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল। জাগিয়া দেখেন, বালিসের উপর মাথা গুঁজিয়া তিনি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছেন; চোখের জলে বালিস ভিজিয়া গেছে।

চোখ মুছিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল।

রোগী সেদিন আসিয়াছিল মাত্র তিন জন, কিন্তু এই তিনজন রোগী বিদায় করিতে সেদিন তিনি ঘণ্টা দুই কাটাইয়া দিলেন। ঘটনাটা ভুলিবার কত চেষ্টাই না তিনি করিলেন, অথচ যত চেষ্টা করেন ততই যেন স্বপ্নটা তাঁহার চোখের সুমুখে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে। প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান লিখিতে গিয়া রোগীর নাম লিখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মনে হইল, যে লোকটা আরতির মাথায় বোতল মারিয়া ছুটিয়া পলাইল, তাহাকে তিনি চিনিতে পারেন নাই, তবে সদানন্দ যে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল, সে দৃশ্য তাঁহার মনে আছে।

কলমের মাথাটা দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ

মনে পড়িল তিনি প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান লিখিতেছেন। একটা ঔষধের নাম লিখিয়াই তিনি আবার চোখ বুজিয়া রহিলেন।—হিন্দুস্থানী পোষাকে আরতিকে মানাইয়াছিল চমৎকার!

যাই হোক, অনেক কষ্টে অনেক ভাবিয়া রোগী বিদায় করিয়া তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। রাম-বিরিজ্‌ স্নানের জল ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। কলের পুতুলের মত স্বপ্নের কথা ভাবিতে ভাবিতেই তিনি স্নান করিলেন। গোকুল খাবার দিয়া গেল। কি যে খাইলেন, কি না খাইলেন, বুঝিলেন না। শহরে যাইবার পোষাক পরিতে গিয়া তাঁহার মনে হইল, আজ আর শহরে গিয়া কাজ নাই, তাহার চেয়ে শয্যায় শয়ন করিয়া আর একবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে দোষ কি!

কিন্তু ঘুম তাহার হইল না। শুইয়া শুইয়া কত কথাই না ভাবিতে লাগিলেন।

বেলা তখন প্রায় তিনটা। গোকুল আসিয়া একখানা চিঠি দিয়া জানাইয়া গেল যে, শহর হইতে এই চিঠি লইয়া পেয়াদা আসিয়াছে। দেখিলেন, সরকারী চিঠি।—মর্গে একটা 'লাশ' আসিয়াছে, ময়না করিবার জন্য এখনই তাঁহাকে যাইতে হইবে।

যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। ব্যাগের ভিতর আবশ্যকীয় জিনিষপত্র লইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি রওনা হইলেন।

এ্যাসিস্‌টেন্ট সার্জ্জেন, পুলিশের ইন্সপেক্টার, দারোগা, সকলেই উপস্থিত।

ডাক্তারবাবু 'মর্গে' গিয়া দেখেন, লম্বা টেবিলের উপর আপাদ-মস্তক ঢাকা দেওয়া মৃতদেহ পড়িয়া আছে। মাথার উপর দেওয়ালের

গায়ে একটি ছিদ্রপথ অতিক্রম করিয়া অস্তমান সূর্য্যের সুদীর্ঘ একটি রশ্মিরেখা ঘরের ঠিক মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে।

ইন্সপেক্টরবাবু বলিলেন, 'আলো থাকতে থাকতে একটুখানি তাড়াতাড়ি করুন ডাক্তারবাবু!'

কালোরঙের একটা লম্বা জামা গায়ে দিয়া, হাতের আস্তিন গুটাইয়া, ডাক্তারবাবু তাঁহার ব্যাগ্ হইতে ছুরি বাহির করিলেন। তাহার পর দ্রুতপদে টেবিলের কাছে গিয়া বাঁহাত দিয়া মৃতদেহের ঢাকা খুলিবামাত্র চোখের সুমুখে ভূত দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, তিনিও তেমনি চমকিয়া উঠিলেন।

'ওরকম করে' উঠ্‌লেন যে? ব্যাপার কি?'

ডাক্তারবাবুর মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না। অতি কষ্টে তিনি হাতের ইসারায় সকলকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন।

এ্যাসিস্‌টেন্ট্ সার্জেন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমিও যাব?'

'ঘাড় নাড়িয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

সকলেই চলিয়া গেল। ডাক্তারবাবু ভিতর হইতে খিল বন্ধ করিয়া দিলেন।

খিল বন্ধ করিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে তিনি টেবিলের কাছে আসিলেন। একাগ্রভাবে দুই ব্যাগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বারে বারে তিনি মৃতদেহের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।

আরতির মৃতদেহ!

এখনও তিন স্বপ্ন দেখিতেছেন কি না, কে জানে।

স্বপ্ন হোক্ সত্য হোক্,—সেই আরতি! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই ঠোঁট, সেই দেহ, সেই অপরূপ রূপ-লাবণ্যবতী সৌন্দর্য্য-প্রতিমা! ডাক্তারবাবু কম্পিত-হস্তে তাহাকে স্পর্শ করিলেন, কপালের উপর খানিকটা কাঁচা রক্ত গড়াইয়া আসিয়া শুকাইয়া গিয়াছিল, পকেট হইতে তাহারই হাতের নাম-লেখা রুমালটি বাহির করিয়া সযত্নে তাহা মুছাইয়া দিলেন, মুখের উপর হইতে চুলগুলি সরাইয়া দিয়া সেই অম্লান প্রফুল্ল প্রস্ফুটিত শতদলের মত অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানি দুই হাত দিয়া তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একসময় তিনি ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাঁচিয়া থাকিতে যাহাকে তিনি তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, মরিয়া আজ সে তাহারই কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে দরজার বাহিরে ঠক্ ঠক্ করিয়া আওয়াজ হইতে লাগিল। ইন্স্‌পেক্টরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর কতক্ষণ?'

ডাক্তারবাবু দেখিলেন, জ্ঞানহীন উন্মাদের মত তিনি তখন তাহার সেই নিঃসাড় নিস্পন্দ হিমশীতল মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া তাহারই অনাবৃত নগ্নবক্ষে মাথা রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছেন।

'এই যে, হ'লো।' বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ছুরিখানি তুলিয়া লইতেই এতদিনের অভ্যস্ত হাত তাঁহার থর্থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এই দেহে আজ তাঁহাকে অতি বড় নিষ্ঠুরের মত ছুরি চালাইতে হইবে। কিন্তু উপায় নাই। ডাক্তারবাবু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, কালই এ কাজ তিনি পরিত্যাগ করিবেন। এই শেষ। বলিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া চোখ বুজিয়া তিনি তাহার সেই শুভ্র সুকোমল বক্ষপ্রান্তে হাতের ছুরিখানি আমূল বসাইয়া দিয়া টানিয়া আনিলেন। তাহার পর নিতান্ত নির্ম্মম কসাইএর মত কাটিয়া

ছিঁড়িয়া মৃতদেহটিকে পরীক্ষা করিতে করিতে হঠাৎ একসময় তাঁহার মাথার ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল, সংজ্ঞাহীনের মত কখন যে তিনি আবার তাহার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছিলেন বুঝিতেও পারেন নাই, বাহিরে আবার করাঘাতের শব্দে তাঁহার জ্ঞান হইল। কাজ তখন তাঁহার শেষ হইয়াছে, আর একবার বেশ ভাল করিয়া চিরজীবনের মত দেখিয়া লইয়া কাপড় ঢাকা দিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। মাতালের মত তখনও তিনি টলিতেছিলেন।

হাতমুখ ধুইয়া ডাক্তারবাবু রিপোর্ট লিখিতে গিয়া দেখিলেন, সদানন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।—'তেওয়ারি আমার এই সর্ব্বনাশ করে' দিলে বাবু, মেয়েটাকে খুন করে' ফেললে।'

ডাক্তারবাবু একবার মুখ তুলিয়া তাকাইয়াও দেখিলেন না, আত্মসমাহিতভাবে নতমুখে বসিয়া রহিলেন।

এ্যাসিস্টেণ্ট সার্জ্জনের বয়স বেশি নয়। নাম বিনোদবাবু। রিপোর্টে তাঁহাকেও সহি করিতে হইবে। সদানন্দকে তাড়াইয়া দিয়া তিনিও ডাক্তারবাবুর কাছে আসিয়া বসিলেন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। চাকর টেবিলের উপর আলো দিয়া গেল। রিপোর্ট শেস করিয়া ডাক্তারবাবু তাহাতে সহি করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার বাঁ-হাতের আস্তিনের ভিতর দিয়া কাগজের উপর টপ্ করিয়া একফোঁটা কাঁচা রক্ত গড়াইয়া পড়িল।

বিনোদবাবু সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।—'এ কী! রক্ত কোত্থেকে পড়লো? আপনার হাত থেকে? কই—দেখি!'

বলিয়া বিনোদবাবু তাড়াতাড়ি জামাটা তাঁহাকে খুলিয়া ফেলিতে বলিলেন। ডাক্তারবাবু জামা খুলিলেন। দেখা গেল তাঁহার বাঁ-হাতের কনুইএর উপরে খানিকটা জায়গা কাটিয়া গেছে।

বিনোদবাবু অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। যে ছুরি দিয়া মৃতদেহ কাটা হইয়াছে, সেই ছুরি দিয়া কাটিয়াছে নিশ্চয়ই। এবং সে যে কি ভীষণ ব্যাপার তাহা ডাক্তারবাবুও জানেন, অথচ তাঁহাকে কিছুমাত্রও বিচলিত হইতে দেখা গেল না। মৃতদেহ কাটিয়া ছিঁড়িয়া হঠাৎ যখন তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময়েই কাটিযাছে বোধহয়। এই কথা ভাবিয়া তিনি একটুখানি হাসিলেন মাত্র। শুধু মনে হইল, কাটিবে তাহা জানা কথা। মনে হইল, মানুষ মাত্রই নিয়তিব হাতে খেলার পুতুল। প্রত্যেকটি জীবনের প্রতিটি ঘটনা বিধাতা আগে হইতেই সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

এমন সময় বিনোদবাবু ছুটিয়া আসিযা ক্ষতমুখে ঔষধ লাগাইয়া দিলেন এবং শুধু ঔষধ লাগাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। শহবে একজন খুব নাম-করা বড় ডাক্তার আছেন, তাঁহাকে ডাকিবাব জন্য লোক পাঠাইলেন।

লোক ফিরিয়া আসিযা বলিল, তিনি 'কলে' গেছেন।'

বিনোদবাবু তাড়াতাডি একখানা চিঠি লিখিয়া ইন্স্পেক্টরবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, 'কল্ থেকে ফিরে এলেই তাঁকে এই চিঠি দেখিয়ে মোটরে করে' যেন ডাক্তারবাবুর বাড়ী নিয়ে যাওযা হয়। আমরা সেইখানেই চললাম।'

ইন্সপেক্টরবাবু চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপার কি খুব—'

বিনোদবাবু বলিলেন, 'বিশ্বাস নেই।'

আবার সেই ভূতুড়ে' বাড়ী। সেই নিস্তব্ধ নির্জ্জন পল্লী-প্রান্তর! আরতির সঙ্গে এইখানেই তাঁহার প্রথম দেখা।

ডাক্তারবাবুর জ্বর আসিয়াছিল। বিনোদবাবু তাঁহাকে ধরিয়া ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন। বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া নীচের 'ডিস্‌পেন্‌সারী-ঘরে' গিয়া তিনি তাঁহার ঔষধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

তাড়াতাড়ি একটা 'ইন্‌জেক্‌সান' দিয়া বিনোদবাবু আবার নীচে নামিয়া যাইতেছিলেন, ডাক্তারবাবু তাঁহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'বসুন!'

বিমর্ষমুখে বিনোদবাবু তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিলেন।

ডাক্তারবাবু ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভয় পেয়েছেন?'

জোর করিয়া ডাক্তারবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'না'।

ঠোঁটের ফাঁকে আবার একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'ভয় পাবার কিছু নেই।'

তাহার পর দু'জনেই চুপ! ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ ছাড়া আর-কিছু শোনা যায় না। চারিদিকে কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

ডাক্তারবাবু চোখ বুজিয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন, সহসা চোখ খুলিয়া বিনোদবাবুর হাতে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জীবনের রহস্য কিছু বুঝেছেন?'

বিনোদবাবু বলিলেন, 'না'।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'চমৎকার!' বলিলেন, 'সুমুখের ওই জানালা দরজা খুলে' দিন।'

গোকুল ও রাম-বিরিজ্ তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া দরজা জানালা খুলিয়া দিল। উদার উন্মুক্ত নীল আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, তাহারই অপর্য্যাপ্ত স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় ঘর ভরিয়া গেল। ডাক্তারবাবু তাঁহার হাত দুইটি বুকের উপর রাখিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

বাহিরে শাখাজালনিবদ্ধ তরুশ্রেণীতলে মর্ম্মরিত ঘন পল্লবের দীর্ঘশ্বাস, আর এই গৃহের মধ্যে স্তম্ভিত সংযত একটি অবাঞ্ছিত নিঃশব্দতা!

বিনোদবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। মনে হইল যেন তাঁহার চোখের সুমুখে শয্যাশায়ী ওই মুমূর্ষ রোগীর অন্তঃকরণ হইতে একটি অব্যক্ত স্তব উত্থিত হইয়া ধীরে ধীরে উর্দ্ধে উঠিতেছে।

কোন্ মঙ্গলময় রহস্যময় বিশ্বদেবতার চরণে কি যে তাঁহার অন্তিম প্রার্থনা কে জানে, তথাপি বিনোদবাবুর একবার মনে হইল, চোখ চাহিলেই তিনি একবার তাঁহার আত্মীয়স্বজনের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, এমন সময় নীচে ফটকের কাছে মোটর দাঁড়াইবার শব্দ হইল। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বিনোদবাবু লণ্ঠন হাতে লইয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

শহরের ডাক্তারবাবু আসিয়াছেন। যাক্, এখনও সময় আছে।

সিঁড়ির উপর জুতার শব্দ করিয়া কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা তিন চারজনে উপরে উঠিয়া আসিলেন।

কিন্তু তাঁহারা সকলে মিলিয়া ডাক্তারবাবুকে জাগাইতে গিয়া দেখেন—তিনি তখন নিস্তব্ধ স্থির মৌন মূক প্রশান্ত গম্ভীর!

তাঁহারা আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

—উপহাস

নাম কাঙ্গালীচরণ।

তা কাঙ্গালীচরণই বটে! যেমন ঢ্যাঙ্গা তেমনি রোগা, পাকানো পাকানো দড়ির মত হাত-পা; দেখিলে মনে হয় যেন পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। কিন্তু পেট ভরিয়া খাইতে না পাইবার মত দুরবস্থা তাহার নয়।

বাড়ী ভাড়া লইতে গিয়াই তাহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। কম ভাড়ায় ভাল একখানি বাড়ীর সন্ধান করিতেছিলাম। খুঁজিতে খুঁজিতে হয়রাণ হইয়া গিয়া শেষে একদিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলাম, বাড়ী ঠিক না করিয়া আজ আর বাসায় ফিরিব না।

আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, ছোট একটি গলির ধারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছোট্ট একখানি দোতালা বাড়ীর দরজায় দেখিলাম—'টু-লেট' টাঙানো। সদর দরজার কড়া নাড়িতেই ভেতর হইতে জবাব আসিল,—'কড়া ধরে' টানুন্, টানলেই খুলে যাবে।'

কড়া ধরিয়া টানিলাম। টানিবামাত্র ওপাশে খুট্ করিয়া আওয়াজ হইল। তাহার পর ঠেলিতেই দেখি, দরজা খুলিয়া গেছে। সুমুখের ঘর হইতে যিনি আমায় 'আসুন' বলিয়া আহ্বান করিলেন তিনিই কাঙ্গালীচরণ।

ঘরের মেঝেয় বসিয়া তিনি তখন অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে একপাটি চটি জুতার নীচে পেরেক্ ঠুকিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'কি চাই?'

'বাড়ী ভাড়া।'

'বসুন।' বলিয়া হাতুড়ি-সমেত সেই কঙ্কালের মত শীর্ণ হাতখানি বাড়াইয়া একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন।

চেয়ারখানি কাঠের, কিন্তু তাহার আগাগোড়া কাপড় দিয়া এমন করিয়া ঢাকা যে, কাঠের চিহ্ন কোথাও দেখিবার জো নাই। জামা দিয়া মানুষ যেমন করিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঢাকিয়া রাখে, কাঙ্গালীচরণও তেমনি একটি জামা সেলাই করিয়া তাঁহার এই চেয়ারখানি ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। ঘরখানি ছোট, কিন্তু তাহার প্রত্যেকটি দেওয়াল এবং মেঝের কোথাও আর তিলধারণের স্থান নাই। ঘবের একটি দেওয়াল ঘেঁসিয়া একটি তক্তপোষ পাতা, তাহার উপর সাদা ধপ্‌ধপে বিছানা; দেওয়ালে টাঙানো অসংখ্য ছবি; তাহার মধ্যে কালী-দুর্গা লক্ষ্মী-সরস্বতীর ছবি ত' আছেই, তাহা ছাড়া বিলাতী মাসিক পত্রিকা হইতে কাটা উলঙ্গ নারীমূর্ত্তি, বিদেশী ক্যালেণ্ডাবেব ছবি এবং বায়োস্কোপের অভিনেত্রীদের নানান্ ভাবভঙ্গীর প্রতিকৃতিব সংখ্যাই বেশি। দেওয়ালের গায়ে দাঁত মাজিবার একটি ব্রাশ, পেরেকের উপর কয়েকটি চায়ের কাপ, তারের শিকায় আধখানি পাউরুটি ঝুলিতেছে, ঘরের এক কোণে একটি ষ্টোভ, ষ্টোভের উপর রান্নার বাসন,—অভাব কিছুই নাই।

একাগ্রমনে এই সব দেখিতেছিলাম, কাঙ্গালীচরণ তাঁহার পেরেক্ ঠোকা শেষ করিয়া জুতা দুইটি ঝাড়িয়া মুছিয়া ঘরের এককোণে নামাইয়া রাখিয়া আমার কাছে আসিয়া বসিলেন। বলিলেন, 'এই সব দেখছেন? দেখুন। সব আমার নিজের তৈরী। কোনও শালাকে একটি পয়সা দিই না, বুঝলেন?'

এই বলিয়া কোথা হইতে একটা আধ-খাওয়া পোড়া বিড়ি বাহির করিয়া তিনি দিয়াশলাই জ্বালিলেন এবং দিয়াশলাই-এর কাঠিটি উঠিয়া গিয়া দরজার বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমার জীবনী 'লিখলে একটা বই হয় মশাই, আমি যে-সে লোক নই। রবিন্‌সন্ ক্রুশোর গল্প জানেন ?'

বলিলাম, 'জানি।'

কাঙ্গালীচরণ চোঁ করিয়া একবার বিড়িটা টানিয়া লইয়া কোঁৎ করিয়া ধোঁয়াটা গিলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'বাংলাদেশের আমিই রবিন্‌সন্ ক্রুশো।'

মনে-মনেই বলিলাম, 'তা হবে; আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

কিন্তু যাহার জন্য আসিয়াছি তাহার এখনও কিছুই হইল না বলিয়া ভিতরে-ভিতরে অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। বলিলাম, 'বাড়ীখানি কি আপনার ?'

কাঙ্গালীচরণ ঘাড় নাড়িলেন। বলিলেন, 'হাঁ, আমারই। রাজ-মিস্ত্রিদের সঙ্গে নিজের হাতে ইঁট গেঁথেছি মশাই! এমন্ বাড়ী আপনি কলকাতা শহরে পাবেন না।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কত ভাড়া ?'

'ভাড়া ?' বলিয়া তিনি একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পর কি ভাবিয়া বলিলেন, 'বলছি। আগে বাড়ীটা দেখুন। হ্যাঁ, আগে বলুন ত' মশাই, আপনার লোক ক'জন ?'

বলিলাম, 'আমি, আমার স্ত্রী আর একটি চাকর।'

কাঙ্গালীচরণের মুখ দেখিয়া মনে হইল তিনি অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন। বলিলেন, 'হ্যাঁ তাহ'লে ঠিকই হবে। এইরকম নির্ঝঞ্ঝাট লোকই আমি চাই মশাই। এর আগে এক ব্যাটাকে ভাড়া দিয়েছিলাম তার একপাল ছেলে। ছেলে ত' নয়, এক-একটি শয়তান। দাপাদাপি করে' আমার বাড়ী-ঘর-দোর ভেঙে ফেলবার জোগাড় করেছিল মশাই।'

দোতলায় তিনখানি মাত্র ঘর। আমার পক্ষে উহাই যথেষ্ট। স্থির হইল, ওই ঘর তিনখানি তিনি আমায় পঁয়ত্রিশ টাকায় ভাড়া দিবেন। উপরেই ছোট্ট একফালি বারান্দা আছে। সেই-খানেই আমার বাসা হইবে। আর নীচের ওই সুমুখের ঘরখানিতে এখন যেমন বাস করিতেছেন তেমনি বাস করিবেন কাঙ্গালীচরণ নিজে এবং তাঁহার এক পনেরোষোলো বছরের অবিবাহিতা কন্যা। সংসারে তাঁহার ওই কন্যাটিই সম্বল। বাকি যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা মরিয়াছেন।

দিন দুই পরেই বাড়ীখানি দখল করিলাম। জিনিষপত্র গোছ-গাছ করিতে বলিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিলাম, ফিরিয়া আসিতেই শুনি কাঙ্গালীচরণ চীৎকার করিতেছেন। কেন চীৎকার করিতেছেন বুঝিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। দেখিলাম, রোগা ছিপ্‌ছিপে সুন্দরী একটি মেয়ে হেঁটমুখে তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া আছে, আর কাঙ্গালী-চরণ বোধ করি তাহাকেই যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতেছেন। অনুমানে বুঝিলাম—এইটিই তাঁহার সেই একমাত্র কন্যা। অপরাধ মাত্র সে চায়ের একটি কাপ কলতলায় ধুইতে গিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়াছে।

মেয়েটির মুখখানি ম্লান। দেখিয়া দয়া হইল। বলিলাম, 'চায়ের একটা কাপ্ ত! যাক্‌গে। তার জন্যে আর—'

কাঙ্গালীচরণের মুখখানা নিমেষেই কেমন যেন অন্যরকম হইয়া গেল।—'কি বললেন? একটা কাপ? হ্যাঁ, একটা কাপ। দাম—দু' আনা। এই দু' আনা পয়সা কোত্থেকে আসে বলুন ত?'

বুঝিলাম, লোকটা অসম্ভব কৃপণ। উহার সঙ্গে আর বাক্-বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই। সিঁড়ি ধরিয়া উপরে উঠিয়া যাইতেছিলাম, পিছনে কাঙ্গালীচরণের ডাক শোনা গেল,—'চল্‌লেন যে মশাই? শুনুন। পয়সাকড়িকে এত হেনস্থা করবেন না, বুঝলেন? ভবিষ্যতে অনুতাপ করতে হবে তা'হলে—এই আমি বলে' রাখলুম। দুটো কাচ্চা-বাচ্চা নেই কিনা, গায়ে ফু দিয়ে বেড়াচ্ছেন। থাকতো যদি একটা বিয়ের বয়েসের বাড়ন্ত মেয়ে ত' বুঝতেন মজা!'

ঈষৎ হাসিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। ভাবিলাম, তাঁহাকে কৃপণ ভাবা সত্যই আমার অন্যায় হইয়াছে। কৃপণতা হয়ত তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই করিতে হয়। মাসে মাসে এই বাড়ীভাড়ার পঁইত্রিশটি টাকা মাত্র সম্বল। দু'জনের খাওয়া পরা, মেয়ের সাজ পোষাক, বাড়ীর ট্যাক্স,—অবশিষ্ট কতই-বা আর থাকে? নিজের অসময়ের জন্য কিই-বা রাখিবেন, আর মেয়ের বিবাহই-বা দিবেন কেমন করিয়া! সেইজন্যই বোধহয় মেয়েটির এখনও বিবাহ হয় নাই। কাঙ্গালীচরণের কথায় রাগ করা উচিত নয়। বেচারা সত্যই গরীব।

সকালে উঠিয়া তিনি নিজেই বাজার করিয়া আনেন। ছোট্ট একটি তোলা উনান ধরাইয়া মেয়েটি রান্না করে। এক পাকে যা' হয় তাই। ভাতের সঙ্গে ন্যাকড়ায় ডাল সিদ্ধ করিতে দেয়, আলু সিদ্ধ

হয়, খুব যদি বেশি হয় ত' দুজনের জন্য দুইটি হাঁসের ডিম সিদ্ধ করিয়া লয়। কিন্তু প্রায় প্রত্যহই দেখা যায়, মেয়েটি তাহার বাপের থালায় সবই ধরিয়া দিয়া, নিজে শেষে নীচের একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে লুকাইয়া লুকাইয়া শুধু ভাতগুলা গিলিয়া গিলিয়া খায়।

আমার স্ত্রী সেদিন ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু মেয়েটা পাছে লজ্জিত হয় বলিয়া কিছু বলিতে পারে নাই।

তাহার পর প্রায়ই দেখি, রান্না শেষ করিয়াই ছোট একটি থালায় তরকারি সাজাইয়া একবাটি ডাল লইয়া গৃহিণী নীচে নামিয়া গিয়া চুপি চুপি ডাকে, 'কৃষ্ণা।'

মেয়েটির নাম বুঝি কৃষ্ণা। বেশ নাম। কিন্তু নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য তাহার কোথাও নাই। গায়ের রং এত পরিষ্কার যে, কৃষ্ণা তাহাকে বলা চলে না। তবু আমাদের কৃষ্ণাই তাহাকে বলিতে হইবে।

কৃষ্ণা কোনদিন 'না' বলে না। হাত পাতিয়া থালাটি গ্রহণ করে এবং সলজ্জ একটুখানি বড় মিষ্টি মধুর হাসি হাসিয়া বোধকরি তাহার কৃতজ্ঞতা জানায়।

সেদিন বাড়ী হইতে বাহির হইতেছি, কাঙালীচরণ ডাকিলেন, 'বলি ও মশাই শুনুন!'

ফিরিয়া দাঁড়াইতেই একমুখ হাসিয়া বলিলেন, 'বলি রোজ রোজ এত কেন করেন বলুন ত?'

'কি করি?'

'এই এত এত তরিতরকারি মাছ ডাল আপনার স্ত্রী রোজই আমার জন্যে পাঠিয়ে দেন। তা এক-আধদিন হয় সেই ভালো, রোজ কেন?

'তাতে আর কি হয়েছে!' বলিয়া চলিয়া যাইতেছিলাম, কাঙ্গালী-চরণ আবার বলিলেন, 'শুনুন, শুনুন, এত তাড়াতাড়ি কেন? তা বৌমাকে বলবেন, তোফা রান্না! এত ভালো লাগে যে একটা টুকরোও কোনদিন আমি ফেলে রাখি না—সব খেয়ে ফেলি।'

তাড়াতাড়ি আমার বাহিরে যাইবার প্রয়োজন ছিল। বলিলাম, 'বেশ করেন।' বলিয়া যেই আমি পা বাড়াইয়াছি, অমনি পিছন দিক হইতে জামায় এক টান পড়িল,—'আরে শুনুন্ না, আর-একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে। আসল কথাটাই এখনও বলা হয়নি।'

আবার দাঁড়াইতে হইল।—'কি কথা বলুন!'

কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'ভাড়াটা তা'হলে কবে নাগাদ্ পাব বলুন দেখি! রসিদ আমি লিখে রেখেছি।'

মাস শেষ হইতে তখনও দু'দিন বাকি। বলিলাম, 'মাসটা আগে শেষ হ'তে দিন। পয়লা তারিখেই পাবেন।'

'বেশ বেশ, পয়লা যেন পাই। আগে থেকে বলে রাখলুম···এই আর কি!' এই বলিয়া কাঙ্গালীচরণ হাসিতে লাগিলেন।

পয়লা তারিখে টাকার জোগাড় করিয়া উঠিতে পারি নাই। সেদিন তেসরা। সেদিনই টাকা পাইবার কথা আছে। ভাবিতেছি, পাইবামাত্র কাঙ্গালীচরণের টাকাটা আগে মিটাইব। টাকা না পাইলে বেচারার কষ্ট হইবে। .

সকালে আমার এক আত্মীয় আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। নীচ হইতে আমার নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র গলার আওয়াজে চিনিলাম। বলিলাম, 'আসুন! সিঁড়ি ধরে' ওপরে উঠে, আসুন!'

তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছি। শুনিলাম, কাঙ্গালীচরণ তাঁহাকে ডাকিতেছেন, 'বলি ও মশাই, শুনুন!···ওপরে যাচ্ছেন? আমার ভাড়ার টাকার কথাটা বাবুকে একবার বলবেন ত! পয়লা তারিখে দেবার কথা ছিল, আজ তেস্‌রা হয়ে গেল। আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়েছি মশাই!'

লজ্জায় মরিয়া গেলাম। আত্মীয়ের সুমুখে এই লইয়া ঝগড়া করাও চলে না, অথচ এই অপমান সহ্য করিয়া মুখ বুজিয়া চুপ করিয়া থাকিতেও কষ্ট হইতে লাগিল।

আত্মীয়কে বিদায় করিয়া কাঙ্গালীচরণের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। ভাবিয়াছিলাম, খুব খানিকটা তিরস্কার করিয়া এ বাড়ীতে যে আমার আর থাকা চলিবে না সেই কথাটাই ভাল করিয়া শুনাইয়া দিয়া আসিব। কিন্তু দেখিলাম, জরাজীর্ণ শতচ্ছিন্ন একখানি খাটো ধুতি পরিয়া আর একখানি কাপড় তিনি সূচ সূতা দিয়া সেলাই করিতেছেন। দেখিবামাত্র রাগটা আমার অনেকখানি কমিয়া গেল। তবু বলিলাম, 'দেখুন, ভাড়ার তাগাদা আপনি আমার কাছেই করবেন, কিন্তু আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব যে এ বাড়ীতে আসবে তার কাছেই যদি ভাড়ার কথাটা বলেন ত' আমার অপমান হয়। তা ছাড়া আমার মত লোকের পাল্লায় পড়ে' যদি আপনার কষ্ট হয় ত' বলুন, আমি চলে যাই।'

হেঁটমুখে কাঙ্গালীচরণ সবই শুনিলেন। মুখের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল এমন করিয়া বলাটা যে তাঁহার উচিত হয় নাই তাহা তিনি এতক্ষণে বুঝিয়াছেন। লজ্জায় বোধকরি তিনি আর মুখ তুলিতে পারিবেন না। তেমনি হেঁটমুখেই বলিলেন, 'আচ্ছা, আর বলব না।'

বলিলাম, টাকা ঠিক সময়ে না পেলে আপনার কষ্ট হয় বুঝি, কিন্তু—

কথাটা আমাকে তিনি আর শেষ করিতে দিলেন না। এইবার তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বলিলেন, 'বোঝেন ত' মশাই! তা আপনি না বুঝলে কে আর বুঝবে বলুন, আপনি একজন শিক্ষিত, বিদ্বান—'

থাক্। আর প্রশংসায় কাজ নাই। মানুষকে সন্তুষ্ট করিবার গুপ্তমন্ত্র কাঙ্গালীচরণ জানেন দেখিতেছি। 'আজই আপনার ভাড়ার টাকা দেবার চেষ্টা করব।' বলিয়া উপরে উঠিয়া যাইতেছিলাম, দেখিলাম, সিঁড়ির পাশে ম্লানমুখে কৃষ্ণা দাঁড়াইয়া আছে। পিতার অভদ্র আচরণের জন্য সেও বোধহয় অনুতপ্ত। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রান্না করছ কৃষ্ণা?'

ঘাড় নাড়িয়া কৃষ্ণা বলিল, 'না। আমাদের আজ নেমন্তন্ন।'

জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া তাহার পরিধেয় বস্ত্রটির দিকে নজর পড়িল। এত ছেঁড়া যে তাহাতে লজ্জা নিবারণ করা শক্ত। তাহাই অতিকষ্টে কোনরকমে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরিয়াছে দেখিলাম। তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গিয়া স্ত্রীকে বলিলাম, 'মেয়েটা কাপড় পরে রয়েছে দেখলাম শতচ্ছিন্ন একেবারে জরাজীর্ণ। জিজ্ঞেস কর ত' ওর কাপড় কি নেই? তাহ'লে তোমার সেই নতুন কাপড়-জোড়াটা—'

কথাটা শেষ করিবার প্রয়োজন হইল না। স্ত্রী তৎক্ষণাৎ সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, 'কৃষ্ণা!'

মৃদুকণ্ঠে জবাব আসিল।—'আমায় ডাকছেন বৌদি?'

'হ্যাঁ ডাকছি। শোনো!'

সিঁড়ি বাহিয়া কৃষ্ণা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

'কাজকর্ম্ম কিছু করছিলে নাকি?'

বুঝিলাম চট্ করিয়া কাপড়ের কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে স্ত্রীর একটুখানি বাধিতেছে।

কৃষ্ণা বলিল, 'সোডা দিয়ে কাপড় সেদ্ধ করতে দিয়েছি।'

'ও, তাই বুঝি এই ছেঁড়া কাপড়টা পরেছ?'

'হ্যাঁ।'

আমার গৃহিণী তাহাকে আরও কি-যেন বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় নীচে হইতে কাঙ্গালীচরণ ডাকিলেন, 'কৃষ্ণা।'

'যাই।'

মুখ ভ্যাংচাইয়া কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'য্যা ই! যেই একটু ফাঁক্ পেয়েছে আর অম্নি ওপরে গিয়ে উঠেছে হতভাগা মেয়ে। কাপড়গুলো কাচ্‌বিই বা কখন্ আর শুকোবেই বা কখন্ আর আমি ইস্তিরিই বা করব কখন? নেমে আয়, চট্ করে', নেমে আয় বলছি।'

কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। কাঙ্গালীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভোলা রয়েছে ওপরে।'

'কই তাত' দেখিনি বাবা?'

ভোলা আমার চাকরের নাম।

কাঙ্গালীচরণ বলিতে লাগিলেন, 'এই যে এই সিঁড়ির নীচেটা এত করে' ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করলাম, ফট্‌ করে' ওই কোথাকার কোন্ এক গুরুপুত্ত্‌র জুতো পায়ে দিয়ে মশ্‌মশ্‌ করে' ওপরে উঠে গেলেন, ব্যাস্, ধুলোয়-কাদায় আবার সব একাকার হয়ে গেল! বলি—এ সব চরণ-ধুলো কি আমাকেই পরিষ্কার করতে হবে নাকি?'

কথাটা কাহাকে বলা হইল বুঝিলাম। লোকটাকে দয়া করা বৃথা। নিজে কিছু না বলিয়া ভাবিলাম, আসুক্ ভোলা, তাহাকে দিয়াই জবাব দেওয়াইব। আমার বাড়ীতে লোকজন জুতা পরিয়াই আসিবে এবং যতবার আসিবে ততবার আমার চাকর গিয়া জল ঢালিয়া ঝাঁটা দিয়া ধূলা পরিষ্কার করিয়া দিবে—সে আবার কি রকম কথা! কিন্তু ভোলাকে বলিবার জন্য অপেক্ষা করিতে হইল না। ঠিক সেই সময়েই ভোলা আসিতেছিল বাজার করিয়া। দরজার কাছেই তাহার সহিত কাঙ্গালীচরণের মুখোমুখি দেখা। তাহাকে দেখিবামাত্র কাঙ্গালীচরণ বলিয়া উঠিলেন, 'বলি কি হে নবাবপুত্তুর, ঘরের কাজকর্ম্ম রইলো পড়ে' আর তুই ব্যাটা গিয়েছিলি কোথায়?'

সর্ব্বনাশ! ভোলা হয়ত' মারিয়াই বসিবে! কথাটা হয়ত সে বুঝিতে পারে নাই। বলিল, 'কাকে বলছেন?'

'বলছি তোমাকেই। বলছি—সকালে উঠে রোজ এই প্যাসেজ্‌টা জল ঢেলে পরিষ্কার করতে হবে।'

'করেছি ত!'

'সে ত' একবার। নাম মাত্তর এক বাল্‌তি জল ঢেলে—বাস্, হয়ে গেল? তারপর—এই যে তোমাদের কে এক বাবু এসে জুতো পায়ে দিয়ে ধূলো-কাদার মচ্ছব্ করে' দিয়ে গেলেন। বলি—এগুলো পরিষ্কার করবে কে? আমি করব?'

ভোলা বলিল, 'না বাবু আপনি কেন করবেন, আমিই করব। কিন্তু যতবার লোকজন আসবে ততবারই জল ঢেলে ঢেলে পরিষ্কার করতে হবে নাকি?'

কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'আল্‌বাৎ করতে হবে। একটু ময়লা আমার বাড়ীতে থাকতে পাবে না তা আমি বলে রাখছি তোকে। থাকে যদি ত' জুতো পেটা করে তৎক্ষণাৎ দূর করে' দেবো বাড়ী থেকে। নোংরা-টোংরা আমি ভালবাসিনে। সে তোর বাবু জানে।'

ভোলা বলিল, 'আমি ত' আপনার বাড়ীতে কাজ করিনে যাবু যে জুতো পেটা করে' দূর ক'রে দেবেন! যতবার বলবেন ততবার জল ঢালতে আমি পারব না। ঢাল্‌তে হয় আপনি নিজে ঢালুন।'

কথা শুনিয়া মনে হইল ভোলা রীতিমত রাগিয়াছে। রাগিবারই কথা। কথাটা বলিয়াই সম্ভবতঃ সে উপরে উঠিয়া আসিতেছিল, কাঙ্গালীচরণ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কি বললি রে হারামজাদা, পাজি ছোটলোক কোথাকার! আমি নিজে জল ঢালব? বলি ও মশাই, শুনছেন আপনার চাকরের কথা? এখনও বল্‌ছি—জল দিয়ে পরিষ্কার করবি ত' কর্, নইলে—'

রাগে আর শেষ কথাটা মুখ দিয়া তাঁহার বাহির হইল না।

'পারব না, যা' বলিয়া ভোলা উপরে উঠিয়া আসিল।

কাঙ্গালীচরণ সেইখান হইতে চীৎকার করিতে লাগিলেন, 'বলি ও মশাই, চুপ করে' রয়েছেন যে? শালা ছোটলোক চাকর আমায় অপমান করে' গেল, আর আপনি শুনছেন বসে বসে? নেবে আসুন মশাই, এর একটা হেস্তনেস্ত করে' দিয়ে যান! বলি—ও মশাই' কই এখনও যে এলেন না?'

মহা মুস্কিলে পড়িলাম। আগাগোড়া সবই শুনিয়াছি। ভোলাকেও

কিছু বলা চলে না, অথচ ভোলার দিক্ হইয়া তাঁহাকে কিছু বলিলেও তিনি অপমান বোধ করিবেন।' ডাকাডাকির চোটে বাহির হইয়া আসিতে হইল। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'শুনলেন ত' নবাবপুত্তুর আপনার চাকরের জবাব? ওকে তাড়িয়ে দিন মশাই, ওকে তাড়িয়ে দিন, জুতো মেরে এক্ষুণি বিদেয় করে' দিন বাড়ী থেকে।'

নীচে তাঁহার কাছে নামিয়া গেলাম। বলিলাম, 'ভাল করে' বললেই একবার কেন, দশবার জল ঢেলে পরিষ্কার করে' দিত। আপনি প্রথমেই যে ওকে চটিয়ে দিলেন।'

'বটে! চাকরেরও পায়ে তেল দিতে হবে? তবে শুনুন্ মশাই, আমি ভারি সাঁচ্চা লোক। আমার ভেতরটাও যেমন পরিষ্কার, বাইরেটাও তেম্‌নি। নোংরা আমি ভালবাসিনে।'

বেশি ঘাটাঘাটি না করিয়া রাস্তাটা ভোলাকে পরিষ্কার করিয়া দিতে বলিলাম। এবং তাহাকে আরও বলিয়া দিলাম যে, মাঝে মাঝে বাড়ীওয়ালা যদি কিছু কাজকর্ম্ম করিতে বলে ত' সে যেন তাহা করিয়া দেয়।

বলিয়া কি বিপদ যে করিলাম তাহা পরে বুঝিয়াছি। পরদিন সকাল হইতে ভোলা আর নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পায় না! আমার সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম তাহাকে ত' করিতেই হয়, তাহার উপর অতি প্রত্যূষে কাঙ্গালীচরণের ডাক শোনা যায়—'ভোলা!

ভোলা তাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলে বলেন, 'জল দিয়ে ধুয়েছিস্ রাস্তাটা?'

ভোলা বলে, 'ধুয়েছি।'

কাঙ্গালীচরণ বলেন, 'বেশ, বেশ, এমনি করে' কথা শুনতে হয় বাবা, কথা না শুনলে ভারি রাগ ধরে। —নে, ওই গড়গড়াটা বেশ করে' ধুয়ে মুছে নতুন করে' ওতে জল ধরে নিয়ে আয়। এনে একবার তামাকটা খাইয়ে দে বাবা।'

গড়গড়ায় জল ধরিয়া তামাক সাজিয়া কলিকায় আগুন দিয়া ভোলা ভাবে এই জন্যই হয়ত তিনি ডাকিয়াছিলেন, তাই সে চলিয়া আসিতে চায়, কিন্তু কাঙ্গালীচরণ অত সহজে ছাড়িবার পাত্র ন'ন। ডাকেন, 'চলে যাচ্ছিস্ কোথায় বাবা, ঘরটা দেখছিস না কি রকম নোংরা হয়ে আছে, দে বাবা ঝাঁটা-টা এনে একহাত পরিষ্কার করে'।'

কিন্তু ঘর পরিষ্কার করিয়াও সে নিষ্কৃতি পায় না, কাঙ্গালীচরণ বলেন, এইবার কুঁজোর জলটা ভরে' দে বাবা, মেয়েটা রান্না করছে, ওর হাত-জোড়া।'

কুঁজোয় জল ধরিয়া দিয়াও নিস্তার নাই। কালি-পড়া লণ্ঠনটা ঘরের কোণ হইতে তুলিয়া আনিয়া কাঙ্গালীচরণ বলেন, 'এঃ, এটা কি হয়েছে দেখেছিস ভোলানাথ? পল্‌তেটা উস্‌কে দিয়ে আর খাটো করে' ছাঁযনি মেয়েটা। ইস্! কি হয়েছে বল্ দেখি! দে ত' বাবা কাঁচটা একবার পরিষ্কার করে'।

ভোলা কাঁচ পরিষ্কার করিয়া দিয়া 'আসি' বলিয়া একরকম লুকাইয়াই সেখান হইতে পলাইয়া আসে।

কাজের সময় ভোলাকে আর পাওয়া যায় না। যখনই ডাকি, দেখি, ভোলার পরিবর্তে কাঙ্গালীচরণ জবাব দিতেছেন, 'আরে

থামুন না মশাই, সারা দিবারাত্রিই ত' সে আপনার কাজ করবে, আমি এই ঘরটা একবার পরিষ্কার করিয়ে নিচ্ছি, বাস্—এই হয়ে গেল বলে'!

কিন্তু সেদিন এক ভারি মজার কাণ্ড ঘটিয়া গেল। কুঁজোয় জল ধরিতে গিয়া—মাটির কুঁজো, ভোলা ভাঙিয়া ফেলিল। আর যায় কোথা! কাঙালীচরণ বলিতে লাগিলেন,—'দিলি ত' ভেঙে! বাস্। জানি আমি হারামজাদা দেবে একদিন আমার সর্ব্বনাশ করে'! নগদ চৌদ্দটি পয়সা দাম, ও-রকম কুঁজো আর পাওয়া যাবে না। আজ যখন বাজারে যাবি তখন অম্নি দেখে একটা কিনে আনিস্।'

ভোলা কুঁজো কিনিয়া আনিল। কিন্তু কাঙালীচরণ পয়সা আর দেন না। চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া ভোলা বলিল, 'কুঁজোর দামটা তাহ'লে—দশ পয়সা নিয়েছে।'

কাঙালীচরণ তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। উপরের দিকে তাকাইয়া হাঁকিলেন, 'বলি ও মশাই, শুনছেন?'

বলিলাম, 'কি বলছেন, বলুন!'

বলিলেন, 'এই ব্যাটার মাইনে থেকে কুঁজোর দাম—দশটা পয়সা কেটে নেবেন ত! আমি এখন আর দাম দিলাম না, বুঝলেন? আপনার বাজারের পয়সা থেকেই নিয়েছি।'

কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম—'কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

কাঙালীচরণ ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন—'আপনার এই চাকর ব্যাটাচ্ছেলে কাল আমার অমন সুন্দর চোদ্দ পয়সা দামের

কুঁজোটা দিয়েছে ফুটিয়ে। আজ তার পরিবর্ত্তে দশ পয়সা দিয়ে একটা কিনে এনেছে। এনে আবার ব্যাটা আমার কাছে পয়সা চায়! তাই বলছি যে, ওকে মাইনে যখন দেবেন তখন এই দশটা পয়সা কেটে নেবেন। আমি মশাই গোলমাল ভালবাসিনে, ভারি সাঁচ্চা মানুষ। বুঝতে পেরেছেন?'

বলিলাম, 'পেরেছি।' ডাকিলাম, 'ভোলা।'

ভোলা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, 'ওঁর কাজ তোকে করতে বলে অন্যায় করেছিলাম ভোলা! কাল থেকে আর...'

ভোলা বলিল, 'আমি আর করলেই ত।'

ভোলা আর তাহার কাজ করে না। শুনিলাম, সেদিন সে তাঁহার মুখের ওপর স্পষ্ট জবাব দিয়াছে, 'না মশাই, আপনি বড় ভীষণ লোক! দরকার নেই আমার কাজ করে', আবার হয়ত কিছু ভেঙ্গে-টেঙ্গে ফেলব।'

কাঙ্গালীচরণের সে রাগটা আসিয়া পড়িল আমার উপর নীচের একখানি ঘরে তিনি থাকেন, বাকি দুখানি ঘর দিনের বেলাতেও অন্ধকার এবং অব্যবহার্য্য। তাহার মধ্যে একখানি ঘর কাঙ্গালীচরণ সিন্দুকভর্ত্তি বাসন-বাক্স প্যাটরা এবং সংসারের খুচরা জিনিষপত্রে বোঝাই করিয়াছেন, আর একখানি ঘর সম্প্রতি এম্‌নি পড়িয়া আছে। সে ঘরে আলো-বাতাস প্রবেশ করিবার পথ নাই বলিয়া সম্প্রতি তাহার দেওয়ালগুলি জুড়িয়া দু'তিন লাখ আরশুলা সপরিবারে নিশ্চিন্ত আরামে বাস করিতেছে। কাঙ্গালীচরণ প্রায়ই

আমাকে বলিত, 'আমার স্ত্রী যখন বেঁচে ছিল তখন সে এই ঘরটায় রান্না করতো মশাই! এ-ঘরে রান্না করার সুবিধে কত? কাছেই কল, কাছেই জল, জলের জন্যে এক-পা নড়তে হবে না, ওপরে রান্না করার চেয়ে অনেক সুবিধে, বুঝলেন?'

আমি চুপ করিয়াই থাকিতাম। যত সুবিধাই হোক্—যে ঘরে আলো—বাতাসের প্রবেশ পথ নাই, ঢুকিলেই যেখানে ভ্যাপ্‌সা গন্ধ পাওয়া যায়, সে-ঘরে রান্না করা আমাদের পোষাইবে না।

কিন্তু কাঙ্গালীচরণ সেদিন কি যে ভাবিলেন কে জানে, আমায় হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, 'দেখুন, ওপরে আপনাদের রান্না করা আর চলবে না। নীচের এই ঘরটাতেই রাঁধতে হবে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন?'

কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'প্রথমে অতটা বুঝতে পারিনি মশাই, তাই আপনাকে ওপরে রাঁধবার 'পারমিশান্' দিয়ে ফেলেছি। কিন্তু এখন দেখছি কয়লার ধোঁয়ায় আমার ওপরের ঘরের রং-টং বোধহয় গেল।'

বলিলাম, 'আজ্ঞে না, রং-এর মধ্যে ত' দেওয়ালের চূণ, তা এখনও বেশ ভালই আছে। তাছাড়া তোলা উনোনে রান্না, উনোন আমার অনেক তফাতে ধরানো হয়।'

কাঙ্গালীচরণ বলিয়া উঠিলেন, 'চূণ কি রকম মশাই, চূণ কি রকম? ওতে শুধু চূণ নেই, আরও অনেক কিছু মেশাতে হয়েছে, আমি নিজের হাতে মিশিয়েছি মশাই, নিজে লাগিয়েছি দেওয়ালে। দেওয়ালের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকবেন, দেখবেন—মনে হবে যেন আকাশের পানে চেয়ে আছেন। যাক্, কয়লার

ধোঁয়ায় সে রং আমার নষ্ট হ'তে দেবো না। আপনারা এই নীচের ঘরে রাঁধবেন কাল থেকে!'

বলিলাম, 'তা যদি হয়, তাহ'লে এ-বাড়ী আমায় ছেড়ে দিতে হবে।'

কাঙ্গালীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছেড়ে দিয়ে যাবেন কোথায়?'

'কলকাতা শহরে বাড়ীর অভাব?'

কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'বাড়ীর অভাব নেই, কিন্তু এ রকম বাড়ী আপনি পাবেন না তা আমি হাঁক্ মেরে বলে দিতে পারি। তাছাড়া সস্তা কত মশাই। পঁইত্রিশ টাকা দিচ্ছেন ওপরের তিন-খানা ঘরের জন্যে, আর নীচের ওই ঘরখানার জন্যে দেবেন পাঁচটা টাকা বাস্—চল্লিশ টাকা। চল্লিশ টাকায় এমন সুন্দর বাড়ী—'ড্যাম্ চিপ্।'

যাই হোক্ আরও পাঁচ টাকা ভাড়া বাড়াইয়া আমাদের নীচের ওই অন্ধকার ঘরে রান্না করাইবার জন্য কাঙ্গালীচরণ হয়ত জীবন আবার দুর্ব্বহ করিয়া তুলিতেন, কিন্তু সেদিন রাত্রে হঠাৎ এক অঘটন ঘটিয়া গেল।

রাত্রি তখন প্রায় একটা বাজিয়াছে। আহারাদির পর আমরা শয়ন করিয়াছি। নীচে কাঙ্গালীচরণেরও কোনও সাড়াশব্দ নাই। কেরোসিন তেল পুড়িবার ভয়ে আলো তাহাদের বেশিক্ষণ জ্বলে না। সন্ধ্যার পরেই আহারাদি শেষ করিয়া আলো নিবাইয়া দেয়। সেদিন ঠিক সেই সময় কৃষ্ণা আমাদের দরজায় আসিয়া ডাকিল, 'বৌদি!'

বৌদিদি তাহার জাগিয়াই ছিল। তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া কৃষ্ণার কাছে গিয়া যে সংবাদ লইয়া আসিল, শুনিয়া আমিও একটুখানি বিচলিত

হইয়া উঠিলাম। কাঙ্গালীচরণের বুক ধড়্‌ফড়্‌ করিতেছে, সর্ব্বাঙ্গে প্রচুর ঘাম হইতেছে, ভয় পাইয়া কৃষ্ণা তাই আমাকে খবর দিতে আসিয়াছে। কৃষ্ণার পিছু-পিছু নীচে নামিয়া গেলাম। দেখিলাম, সত্যই তাই। কাঙ্গালীচরণের গলার আওয়াজ অত্যন্ত ক্ষীণ। বলিলেন, 'আপনার কাছে হোমিওপ্যাথি ওষুধ আছে, না? দিন ত' আমাকে একটুখানি। দেখি—সারে কিনা।'

ঔষধ দিলাম। এবং তাহারই ফলে সারিল কি না জানি না, সকালে দেখিলাম, দিব্য সহজ মানুষের মত কাঙ্গালীচরণ ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেমন আছেন? সেরে গেছে ত?'

কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'কোথায় মশাই! হোমিওপ্যাথি ওষুধে আবার রোগ সারে! শুনুন তবে। এই বাড়ীখানা এক ভদ্রলোক ভাড়া চাইলেন, সত্তোর টাকায়—ওপর নীচে সমস্ত ঘর। আমার স্ত্রী তখন বেঁচে। দিলাম বাড়ীখানা ভাড়ায় বসিয়ে, আর আমরা নিজেরা উঠে গেলাম এই কাছাকাছি একটি গলির মধ্যে একখানা বাড়ীতে। কলকাতায় তখন খুব কলেরা হচ্ছে। হঠাৎ একদিন রাত্তিরবেলা স্ত্রীর কলেরা হ'লো, ঘণ্টাখানেক পরে আবার হলো আমার ছেলের। ছেলেটি ছিল কৃষ্ণার চেয়ে বছর দুই-এর বড়। সকালবেলা একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ডাকলাম। এত এত ওষুধ দিলেন, এত চেষ্টা করলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই কিছু হ'লো না—উঠো-উঠি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দু'জনেই গেল মরে'! এই ত' আপনাদের হোমিওপ্যাথি ওষুধ মশাই!'

কৃষ্ণা কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। এবার আর সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল, 'দশটাকা ভাড়া দিয়ে যে-রকম নোংরা বাড়ীতে

আমরা উঠে গিয়েছিলাম, সে বাড়ী থেকে আমরা দু'জনও যে ফিরে আসতে পেরেছি বাবা এই যথেষ্ট। আর তাছাড়া আমাদের যতীনদাদা আবার ডাক্তার! বই পড়ে' পড়ে' বাড়ীতেই ডাক্তারী শিখেছে। ওই অতবড় রোগীর ভার তুমি দিলে তারই হাতে ফেলে! কেন যতীনদাদা ত' তোমাকে অন্য ডাক্তার আনতে বলেছিল বাবা। তুমি বললে, টাকা কোথায় পাব। তা তুমি একটু চেষ্টা করলে, মা আমার মরতো না।'

বলিতে বলিতে মেয়েটার ঠোঁট দুইটি থর্-থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসিতেই সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল!

কাঙ্গালীচরণ প্রচণ্ড এক ধমক্ দিয়া উঠিলেন, 'যা যা তুই কি জানিস্! তুই চুপ কর্! মৃত্যু যার আছে হাজার বড় ডাক্তার ডাকলেও তাকে রক্ষা করা যায় না,—না কি বলেন মশাই।'

বলিয়া তিনি আমার মুখের পানে তাকাইলেন।

কোনও জবাব না দিয়াই আমি আমার কাজে চলিয়া যাইতেছিলাম, কাঙ্গালীচরণ হাঁকিয়া বলিলেন, 'বলি ও মশাই, চলে যাচ্ছেন যে? আমি যা বলেছিলাম তার কি হ'লো? হাঃ, ভাগি ত' পাঁচটা টাকা পঁয়ত্রিশ দিচ্ছেন, না হয় দেবেন চল্লিশ। নীচে রান্নার সুবিধে কত!'

বলিলাম, 'আচ্ছা এরপর ভেবে দেখব।'

'না না ভেবে দেখব নয়, ও করে ফেলুন।'

টাকার কথা ভেবে আর পিছিয়ে যাবেন না। টাকা জিনিষ— আসতেও যতক্ষণ আবার যেতেও ততক্ষণ! আমি ত' মশাই নিজের সুখ সুবিধের চেয়ে টাকা জিনিষটাকে বড় করে' কখনও দেখতে পারলাম না। এই দেখুন না আপনি মাসে মাসে পঁইত্রিশটি করে

টাকা দিচ্ছেন, ব্যস্, হাতে আসতে না আসতে ফুট-কড়াই! টাকা জিনিষটে আমার হাতে কখনও রইলো না, ও ব্যাটার জাত কারও হাতেই থাকে না। বুঝলেন, নীচে রাঁধবার ব্যবস্থাটাই করে' ফেলুন।'

কৃষ্ণার বয়স হইয়াছে, সর্ব্বদেহে তাহার পরিপূর্ণ যৌবনশ্রী। এইবার বিবাহ দেওয়া তাহার একান্ত প্রয়োজন। আমার স্ত্রীর সঙ্গে সেদিন সেই কথাই হইতেছিল। স্ত্রী বলিল, 'ওর বাবাকে একদিন বোলো। মেয়েটাকে সত্যিই আর এমন করে' রাখা উচিত নয়।'

বলিব বলিব ভাবিতেছিলাম, এমন দিনে দেখিলাম, একজন ঘটক একদিন জন-দুই ভদ্রলোককে ডাকিয়া আনিয়াছেন!

কাঙ্গালীচরণ ডাকিলেন, 'বলি ও মশাই, একবার নীচে নেমে আসুন ত!'

নীচে যাইতেই তিনি আমায় একটুখানি আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া চুপি-চুপি বলিলেন, 'ঘন ঘন যে রকম অসুখ বিসুখ হচ্ছে মশাই, কি জানি বিশ্বাস নেই যদি কোনোদিন হট্ করে'··· তাই ভাবছি, মেয়েটার বিয়েটা এইবার সেরে' ফেলি। দু'জন ভদ্রলোক এসেছেন ওকে দেখতে, আপনি একটুখানি আসুন, দু'চারটে কথাবার্ত্তা বলুন ওদের সঙ্গে, আর আমার অবস্থার কথাটাও অমনি···'

যাক্, এতদিন পরে সুমতি তাঁহার হইয়াছে। দেখিলাম, যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বরের কাকা আর একজন বাবা। ছেলেটি বি-এ পাশ করিয়া এম্-এ পড়িতেছে, অবস্থা খুব যে ভালো তা নয়, কলিকাতা শহরে একখানি বাড়ী আছে, তাছাড়া ছেলেটির দাদা নাকি ওকালতি পাশ করিয়া সম্প্রতি উকিল হইয়াছেন। পসার এখনও

জমাইতে পারেন নাই, তবে ভগবানের ইচ্ছায় ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন জমে ত' তখন আর তাহাদের ভাবিতে হইবে না।

মন্দ কি। ছেলেটি যদি দেখিতে শুনিতে ভাল হয় ত' কৃষ্ণার বিবাহ এইখানেই দেওয়া উচিত।

কৃষ্ণাকে তাঁহারা দেখিলেন। দেখিয়া অপছন্দ করিবার কিছুই নাই। চমৎকার মেয়ে!

কিন্তু গোলমাল বাধিল টাকার ব্যাপারে। বরের বাবা বলেন, 'মেয়ে আমার খুব পছন্দ হয়েছে, ছেলের সঙ্গে মানাবেও ভাল, কিন্তু ছেলের বিয়ে—বাড়ী থেকে টাকা খরচ করে' ত' আর দিতে পারি না মশাই। নগদ টাকা আপনাকে কিছু দিতে হবে বই-কি!'

কাঙ্গালীচরণ আমার মুখের পানে নিতান্ত অসহায়ের মত একবার তাকাইলেন। তাকাইবার অর্থটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বলিলাম, 'কত টাকা চান?'

বরকর্ত্তা বলিলেন, 'মেয়েব মা'র যা গয়না আছে শুনছি তাই দিলেই না-হয় গয়নাটা আর লাগবে না, কিন্তু টাকা—তা অন্তত শ-পাঁচেক দিতে হবে নগদ। তার কমে মশাই ছেলের বিয়ে দিতে আমি পারব না।'

কাঙ্গালীচরণ ম্লান একটুখানি হাসিলেন বলিলেন, 'সে ক্ষমতা কি আমার আছে দাদা? বড় জোড় শ'খানেক টাকা আমি ধার-ধোর করে' যেখান থেকে হোক্…মেয়ের দায় যখন ঘাড়ের ওপর, এই আপনার দু'টি হাতে ধরে বলছি ভাই আমায় উদ্ধার করুন।'

বলিয়া কাঙ্গালীচরণ দুই হাত বাড়াইয়া বরকর্ত্তার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিলেন।

বরকর্ত্তা লোকটি ভাল। কাঙ্গালীচরণের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার

দয়া হইল। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, আপনি এত করে' বলছেন যখন, তখন তিন শ' টাকা দেবেন। বৌ-ভাতে আমি নিজেও না হয় কিছু খরচ করব।'

মাত্র তিনশ' টাকা খরচ করিয়া কাঙ্গালীচরণ যদি তাঁহার মেয়ের জন্য এমন বর পান ত' মন্দ কি! বলিলাম, 'আচ্ছা বেশ, কবে আমরা ছেলেটি তাহ'লে দেখতে যাব বলুন!'

ছেলের বাবা বলিলেন, 'যেদিন খুশী। এই ত' ভবানীপুরে বাড়ী—বেশি দূরে ত' নয়।'

স্থির হইল, আগামী রবিবার কাঙ্গালীচরণকে সঙ্গে লইয়া আমি নিজেই ছেলেটিকে দেখিয়া আসিব।

কৃষ্ণাকে বলিলাম, 'কিরে! মুখখানি অমন শুক্‌নো করে' দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন দিদি, তোর বর দেখতে যাব। বিয়ে-থা হ'লে আমাদের ভূলে যাবিনে ত'!'

কৃষ্ণা তাঁহার সেই চোখ দুইটি তুলিয়া সেই তেমনি করিয়াই একবার হাসিল। বড় সুন্দর সে হাসি। অত্যন্ত করুণ, অথচ একবার সে হাসি যে দেখিয়াছে সে আর তাহাকে জীবনে ভুলিবে না।

রবিবার বৈকালে ভবানীপুরে যাইবার কথা। কিন্তু সকালে কাঙ্গালীচরণ আমায় কাছে ডাকিয়া চুপি-চুপি বলিলেন, যাক, আর সেখানে যেয়ে কাজ নেই মশাই।'

বলিলাম, 'কেন?'

কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'না। তিনশ' টাকা নগদ দেওয়া আমার দ্বারা সম্ভব হবে না মশাই। কোথায় পাব? বড় জোড় একশ', নাহয় 'দেড়শ' পর্য্যন্ত দিতে পারি।'

আমার নিজের টাকা থাকিলে হয়ত' তখন নিজেই দিতাম, কিন্তু সেদিক দিয়া দুর্ভাগ্য আমারও কম নয়। বড় দুঃখ হইল। বলিলাম, 'তাহ'লে আর কি হবে বলুন! কিন্তু মেয়েও ত' বড় হয়েছে, বিয়েরও ত একটা চেষ্টা করা দরকার।'

কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'দেখি।'

তাহার পর দশ পনেরো দিনের মধ্যে ঘটক-ঠাকুর বোধ হয় আরও পাঁচজন বরকর্ত্তাকে আনিয়া হাজির করিল। কিন্তু সকলেরই সেই এক প্রস্তাব। টাকা! এদিকে কাঙ্গালীচরণেরও সেই এক কথা—একশ' কি বড়জোর দেড়শ' দাদা, তার বেশি আমি পাব কোথায়···গরীব মানুষ···ইত্যাদি।

বেচারা হয়ত দেড়শ' টাকা অতি কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছে। তাহাকেই বা দোষ দিই কেমন করিয়া!

শেষে কোথাও যখন কিছু আর হয় না, কাঙ্গালীচরণ নিজেই একদিন সন্ধ্যার সময় হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিয়া ডাকিলেন, 'ও মশাই, শুনুন, শুনুন। সুসংবাদ!'

কি সুসংবাদ জানিবার জন্য নীচে আসিয়াই শুনিলাম এতদিন পরে কৃষ্ণার বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত তিনি নিজেই স্থির করিয়া আসিয়াছেন, বলিলেন, 'আরে মশাই, পরের দ্বারা কি কোনো কাজ কখনও হয়? ওকি ঘটকের কর্ম্ম!'

এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, 'চলুন একদিন—'

বলিয়াই কি ভাবিয়া কথাটা পাল্‌টাইয়া লইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—'বড়লোকের ছেলের খাঁই মেটাবার সাধ্যি কি আমার আছে মশাই, আমরা নিজেরা যেমন, তেমনি মাঝামাঝি ঘরে মেয়ের বিয়ে দেওয়াই ভাল—আপনি কি বলেন?···যা করেন জগদম্বা! এই মাসেই সেরে ফেলি। শুভস্য শীঘ্রং।'

বলিলাম, 'চলুন তাহ'লে একদিন দেখে আসি।'

কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'কিছু দেখতে হবে না মশাই! কিছু দেখতে হবে না। অবস্থা, ভাল কি না তাই লোকে দেখতে যায়, কিন্তু এ একেবারে জানা কথা। অবস্থা ভাল নয়। মাইনর ইস্কুলের পণ্ডিত কোনো রকমে দিন চলে' যাবে—বাস্! মেয়েটা খেতে পরতে পাবে। আর কি চাই?'

ইহার উপর আর কথা চলে না। নিজের কন্যার বিবাহ নিজে স্থির করিয়াছেন, ভাল মন্দ তিনিই বুঝিবেন।

এই বাড়ীতেই বিবাহ, অথচ এখানে জায়গার একান্ত অভাব। সে-সম্বন্ধে কি করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'কি আর করব? কিছুই করব না।'

বলিলাম, 'বরযাত্রীদের খাবার জায়গা ত' একটা করতে হবে। ছাদের ওপর হোগ্‌লা দিয়ে—সবাই যেমন করে—'

কাঙ্গালীচরণ ঈষৎ হাসিলেন,। বলিলেন, 'পাগল হয়েছেন? সে কি আর আমি ঠিক না করেই এসেছি! বরযাত্রী আসবে চারজন। হোগলা কি জন্য? বেশী বরযাত্রী খেতে দেবার অবস্থা কোথায়? আপনার ওপরের একখানা ঘর ছেড়ে দেবেন, বাস্—তাহ'লেই হবে!'

একখানা কেন, কৃষ্ণার বিবাহের জন্য আমি কয়েকদিনের জন্য এ

বাড়ী ছাড়িয়া যেখানে হোক চলিয়া যাইতেও রাজি। কিন্তু কিছুই করিতে হইল না। বরপক্ষ মেয়েও দেখিতে আসিলেন না, কন্যাপক্ষ বর দেখিতেও গেলেন না। বিবাহের আগের দিন কৃষ্ণার গায়ে-হলুদের সমস্ত ব্যবস্থা আমার স্ত্রী-ই করিয়া দিল।

পরদিন সন্ধ্যায় বর আসিল—বরের সঙ্গে মাত্র চারজন বরযাত্রী। বর দেখিয়া প্রথমে তাহাকে কৃষ্ণার বর বলিয়া চিনিতে পারি নাই, ভাবিয়াছিলাম—সেও একজন বরযাত্রীই হইবে বা। কিন্তু শেষে যখন তাহার ধুতি-চাদর এবং কপালে চন্দনের ফোঁটা দেখিলাম, তখন একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। এই কৃষ্ণার বর। গায়ের রং কালো, চক্ষু দুইটি কোটর-প্রবিষ্ট, শীর্ণ কঙ্কালসার বয়স বোধকরি কাঙ্গালীচরণের চেয়ে দু'চার বছরের ছোট।

আমার স্ত্রী ছি-ছি করিতে লাগিল। আমি ত' কৃষ্ণার মুখের পানে তাকাইতেই পারিলাম না। শুধু নির্ব্বিকার রহিলেন দেখিলাম—কাঙ্গালীচরণ।

কাঙ্গালীচরণকে একবার আড়ালে পাইয়া চুপি চুপি বলিলাম, 'এ কি করলেন আপনি—ছিঃ।'

কাঙ্গালীচরণ আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন 'কেন? কি তার এমন হয়েছে শুনি? আচ্ছা ধরুন, আমার স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে, আমিই যদি বিবাহ করতুম, তাহলে—পুরুষ মানুষের আবার বয়েস, পুরুষ মানুষের আবার চেহারা।

মুখ বুজিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেলাম।

এখন আর দুঃখ করিয়াই বা লাভ কি।

যাই হোক নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ চুকিয়া গেল। কৃষ্ণার অদৃষ্ট।

আট-দশ জন লোকের আহারের ব্যবস্থা আমার স্ত্রী নিজেই করিয়াছিলেন। বরযাত্রী কয়েক জনকে খাইতে বসাইয়া আমিই পরিবেষণ করিতেছি, কাঙ্গালীচরণের উপবাসী শরীর, দূরে দাঁড়াইয়া তিনি তাঁহাদের খাওয়া দেখিতেছেন। খাওয়া যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ঘরের ভিতর সন্দেশ আনিতে গিয়া দেখি—সন্দেশ নাই। সন্দেশ আনাইবার কথা কাঙ্গালীচরণকে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সন্দেশ কি এখনও আনানো হয়নি?'

কাঙ্গালীচরণ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'না।'

সে কি মশাই? ভোলাকে দিয়ে এক্ষুণি আনাতে পাঠান।'

কাঙ্গালীচরণ কোঁচড় হইতে অতি কষ্টে একটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

ব্যাপারটা বরযাত্রীদের দৃষ্টি এড়াইল না। তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, 'একশ' টাকা ত' নগদ নিয়েছেন মশাই, তাও মিষ্টি আন্‌তে ভুলে গেলেন। আমরা লোক ত' মোটে চারজন!'

আর একজন বলিয়া উঠিলেন, 'একশ' কি রকম, শেষ পর্য্যন্ত দেড়শ' টাকায় রফা হ'লো যে! সেদিন একশ' এনেছেন, আর আজ দিতে হবে পঞ্চাশ।'

এরকম যে কোনোদিন হইতে পারে তাহা জানিতাম না। কথাটা শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। টাকা লইয়া কৃষ্ণাকে ওই বুড়োর হাতে বিক্রি করা হইয়াছে! কাঙ্গালীচরণের পক্ষে ইহার চেয়ে নৃশংসতা আর কি হইতে পারে!

বিবাহের সময় দেখিলাম, কৃষ্ণার মুখে যেন আর রক্ত নাই, স্থির, ধীর, নির্ব্বিকার,—যাহা বলিতেছে তাহাই করিতেছে; যেন কোথাও কিছুই হয় নাই এমনি ভাব।

পরদিন স্বামীর সঙ্গে সে শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া গেল। শ্বশুর-বাড়ী যাইবার সময় মেয়েরা কান্নাকাটি করে, এতদিনের প্রিয় পিত্রালয় ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট হয়, কিন্তু কৃষ্ণাকে দেখিলাম, চোখে তাহার একফোঁটা জলও আসিল না, কেমন যেন বোকার মত ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া তাহার বাবার মুখের পানে তাকাইয়া—হেঁটমুখে গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমার স্ত্রী বারান্দার রেলিং ধরিয়া তাহার চলিয়া যাওয়া দেখিতেছিল, উপরে উঠিয়া গিয়া দেখিলাম, জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সে তাহার চোখের জল মুছিতেছে। আমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা সে প্রয়োজন বোধ করিল না। আমি ঘরে ঢুকিতেই সে ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া গেল। সমস্ত বাড়ীখানা কেমন যেন একটা বিষন্ন গাম্ভীর্য্যে থম্‌-থম্‌ করিতে লাগিল।

কৃষ্ণা চলিয়া যাইবার পর হইতে কাঙ্গালীচরণ আমার এখানেই খাইতেছিলেন। প্রস্তাব করিয়াছিলেন, নিজেই রান্না করিয়া খাইবেন, কিন্তু আমিই তাহাতে বাধা দিলাম। ভাবিলাম, এখন ত' আর কন্যাদায় নাই, মাসের শেষে বাড়ীর ভাড়া হইতে কিছু টাকা ইহার জন্য কাটিয়া লইলেই চলিবে।

কিন্তু মাসের শেষে ভাড়া দিতে গিয়া একেবারে বেকুব বনিয়া

গেলাম। টাকা ত' তিনি খাওয়ার জন্ম দিলেনই না, উল্টা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, 'এবার ত' হাঙ্গামা কমেছে মশাই, এবার আমার সেই কথাটা—'

কথাটার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি কথা ?'

তিনি বলিলেন, 'মনে নাই ? আপনাদের সেই নীচে রাঁধবার কথা !'

বলিলাম, 'সে ত' বলেই দিয়েছি—নীচে রান্না করা আমার হবে না !'

কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'আপনি কিন্তু ভাল বুঝছেন না মশাই ! পাঁচটা টাকার জন্যে এরকম কৃপণতা করবেন না, এতে আপনার স্ত্রীর কষ্ট হচ্ছে—আমি বুঝতে পারছি যে !'

কাঙ্গালীচরণ আমার স্ত্রীর এত কষ্ট বুঝিলেন কিন্তু তাঁহার কষ্ট আমার স্ত্রী কিছুতেই বুঝিল না। বলিল, 'না না ওকে ভাত রেঁধে খাওয়াতে আমি পারব না। এতদিন শুনিনি, কিন্তু যেদিন থেকে তুমি বলেছ, দেড়শ' টাকা নিয়ে কৃষ্ণার মত মেয়েকেও ওই বুড়োর হাতে তুলে দিয়েছে সেইদিন থেকে ওর ওপর ভক্তি আমার চটে' গেছে। লোকটা চামারের একশেষ।'

সুতরাং কাঙ্গালীচরণকে আজকাল নিজেই রান্না করিয়া খাইতে হয়। ষ্টোভ্ জ্বালিয়া কি যে রান্না করেন তিনিই জানেন। সাবান দিয়া ধুপ্ ধুপ্ করিয়া কাপড় কাচেন ইস্তিরি করেন, ঘর ঝাঁট দেন এবং প্রতিদিন বৈকালে নিজের হাতে কাচা জামা-কাপড় পরিয়া একটি ছড়ি হাতে লইয়া বেড়াইতে বাহির হন। সে-সময়

আমার সঙ্গে যদি কোনোদিন দৈবাৎ দেখা হইয়া যায় ত' নিজের কাপড়-জামা দেখাইয়া বলেন, 'দেখুন মশাই, আমার নিজের হাতে কাঁচা, আর ওই ত' আপনার গায়ে রয়েছে ধোপা-বাড়ীর কাচা,—কত তফাৎ দেখুন! আমি যা কেচে দেবো, সেরকম কাচতে ধোপার বাবাও পারবে না।'

কাঙ্গালীচরণ ওই আনন্দেই থাকেন। কৃষ্ণার কথা কোনোদিন তাঁহাকে ভুলিয়াও বলিতে শুনি না।

আমরা স্বামী-স্ত্রীতে ববং বলাবলি করি—'আহা মেয়েটির আচ্ছা অদৃষ্ট যা-হোক্। এমন অনেক গরীবের মেয়েও ত' দেখেছি যারা মনের মত স্বামী পায়। কিন্তু এ মেয়েটার কি হ'লো বল দেখি?'

গৃহিণী বলেন, শ্বশুরবাড়ী ত' ভবানীপুরে, বুড়োর কাছে ঠিকানা নিয়ে চল না একদিন কালীঘাট যাবার নাম করে' কৃষ্ণাকে দেখে আসি।'

যাইতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু যাওয়া কোনোদিনই হইয়া ওঠে না।

বিবাহেব পর সেই যে কৃষ্ণা এখান হইতে স্বামীব ঘর করিতে গিয়াছে, তাহার পর আজ প্রায় পাঁচ ছ'মাস হইতে চলিল, একটি দিনের জন্যও সে আর এখানে আসে নাই।

বুড়া স্বামী তাহার ইস্কুলের পণ্ডিত। সকালে খাইয়া তাহাকে ইস্কুলে যাইতে হয়, কৃষ্ণা ভাত রাঁধে, স্বামীকে খাওয়াইয়া ইস্কুলে পাঠাইয়া দেয়, তাহার পর সারাদিন হয় ত' একলা ঘরে বসিয়া বসিয়া কাঁদে। পণ্ডিতমশাই-এর প্রথম-পক্ষের স্ত্রীর একটি মেয়ে আছে শুনিয়াছি। মেয়েটি বয়সে কৃষ্ণার চেয়েও বড়। তাহার

দু'তিনটি ছেলেমেয়ে। সেই হয়ত' বাপের জন্য রান্না-বান্না সবই করিয়া দিত, আজকাল হয় ত' সৎমার হাতে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছে। হয়ত' সে সুযোগ-সুবিধা পাইলেই কৃষ্ণার সঙ্গে ঝগড়া করে। কৃষ্ণার হয়ত' দুঃখ-কষ্টের আর অবধি নাই!

মনে-মনেই এই সব কথা ভাবি আর সেই নিরীহ শান্ত মেয়েটির কথা মনে পড়ে। কাঙ্গালীচরণের মেয়ে বলিয়া তাহাকে মনে হয় না। মনে হয় সে যেন আমার নিজের বোন। নিতান্ত অনাত্মীয়া অপরিচিতা ওই মেয়েটির জন্য কষ্ট হয়।

অদৃষ্ট তাহার মন্দ তাহা জানি' কিন্তু এত মন্দ সেকথা কোনদিন ভাবিতেও পারি নাই। বুড়া স্বামী যে তাহার বেশিদিন বাঁচিবে না, কৃষ্ণার বিবাহ হওয়া না হওয়া দু-ই সমান হইয়া যাইবে, সে আশঙ্কা যে মনে-মনে করিতাম না তাহা নয়, তবে হঠাৎ যে এমন একটি অঘটন ঘটিবে তাহা ছিল আমাদের ধারণারও অতীত।

সেদিন বৈকালে ভবানীপুর হইতে একটি ছোকরা একরকম ছুটিতে ছুটিতে কাঙ্গালীচরণের কাছে আসিয়া উপস্থিত! কাঙ্গালীচরণ গড়-গড়ায় তামাক টানিতেছিলেন আর আমি কোথায় যেন বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম।

ছোক্‌রাটি বলিল, 'শীগ্‌গির আসুন।'

ব্যাপার কি জানিবার জন্য তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। যাহা শুনিলাম তাহাতে আমার আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল, বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। শুনিলাম, ইস্কুলের ছুটির পর

কৃষ্ণার স্বামী বাড়ী ফিরিতেছিলেন, রাস্তা পার হইতে গিয়া হঠাৎ একটা মোটর চাপা পড়িয়াছেন। বাঁচেন কিনা সন্দেহ!

পা দুইটা তখন আমার থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। কাঙ্গালী-চরণের হাত হইতে গড়গড়ার নল মাটিতে পড়িয়া গেছে। বলিলাম, 'চলুন।'

কাঙ্গালীচরণও কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'কোথায় আছেন?'

ছেলেটি বলিল, 'হাসপাতালে।'

হাসপাতালে যখন আমরা গিয়া পৌঁছিলাম তখন সব শেষ হইয়া গেছে। আপাদমস্তক কাঁচা রক্তে ছোপানো একটা কাপড় দিয়া ঢাকা কৃষ্ণার স্বামীর মৃতদেহ। পাশেই একটি মেয়ে মাথার চুল খুলিয়া, বুক চাপড়াইয়া মাথা ঠুকিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া লোক জড়ো করিয়াছে। এইটিই বোধহয় পণ্ডিত-মশাই-এর ও-পক্ষের মেয়ে। আর সেই অতগুলো লোকের মাঝখানে স্বামীর মৃতদেহের পাশে একেবারে কাঠ হইয়া, নতনেত্রে বসিয়া আছে আমাদের কৃষ্ণা। মুখে কথা নাই, চোখ দুইটি শুধু কাণায়-কাণায় জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। আমাদের পানে একবার মুখ তুলিয়া তাকাইয়াই তৎক্ষণাৎ সে আবার চোখ দুইটি নামাইয়া লইল। দেখিলাম, টস্ টস্ করিয়া অশ্রুর ফোঁটা তাহার কাপড়ের উপর গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

মৃতদেহের সৎকার করিয়া কৃষ্ণাকে বিধবার বেশ পরাইয়া, বাসায় ফিরিলাম পরদিন সকালে।

কাঙ্গালীচরণ প্রত্যহ আনাগোনা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণার

ামীর শ্রাদ্ধাদি চুকিয়া গেল। ভাবিয়াছিলাম, কৃষ্ণা এইবার হয়ত আবার তাহার বাবার কাছেই আসিয়া বাস করিবে, আবার সেই আগেকার মত সুখে-দুঃখে দিন তাহাদের চলিয়া যাইবে। কিন্তু সেদিন আমি কাঙ্গালীচরণের সঙ্গেই ছিলাম; কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'চল্ কৃষ্ণা, তোকে আমি সঙ্গে করেই নিয়ে যাই।'

শুনিলাম, স্পষ্ট রূঢ়বাক্যে ঘাড় নাড়িয়া কৃষ্ণা জবাব দিল, 'না।'

'যাবি না?'

'না।'

কাঙ্গালীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাহ'লে কি এইখানেই থাক্‌বি ভেবেছিস্?'

কৃষ্ণা বলিল, 'হ্যাঁ। এইখানেই থাকব।'

এই বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

কাঙ্গালীচরণ নিতান্ত নিরুপায়ের মত আমার দিকে একবার তাকাইলেন। অর্থাৎ—আপনি একবার অনুরোধ করুন মশাই।

কিন্তু কৃষ্ণার মুখের পানে তখন আমার আর তাকাইবার ক্ষমতা নাই। মেয়েটা যদি রাগ করিয়াই কাঙ্গালীচরণের সমস্ত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া থাকে ত' তাহাকেই বা কি বলিবার আছে! তাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই সে করুক।

আমি সরিয়া দাঁড়াইলাম।

বাড়ী ফিরিবার সময় সারা রাস্তা ধরিয়া কাঙ্গালীচরণ একটি কথাও বলিল না। যে কাঙ্গালীচরণ এত বেশি কথা কয়, তাহাকেই দেখিলাম নীরবে মুখ বুজিয়া কি যেন ভাবিতেছে। নিজের কৃত-

কর্মের জন্য এতদিন পরে অনুশোচনা জাগিয়াছে কিনা তাই-বা কে বলিতে পারে!

আমার স্ত্রীর সঙ্গে সেদিন কথা হইতেছিল!—'কৃষ্ণা বোধহয় রাগ করে' এলো না। তুমি কি বল?'

স্ত্রী বলিল, 'বেশ করেছে। আমার যদি ও-রকম বাবা হ'তো ত' আমি তার মুখ দেখতাম না।'

আমি বলিলাম, 'আহা বাবার কি দোষ! সেও ত' গরীব। পয়সা কড়ি থাকলে হয়ত মেয়েটাকে সে অমন করে' জলে ফেলে দিত না।'

স্ত্রী চুপ করিয়া রহিল।

'কি ভাবছ?'

'ভাবছি, বিয়ে ওর না দিলেই হতো।'

'তাই বা কেমন করে' হয় বল। মেয়ে ত' বড় হয়েছিল!'

'হ'লই বা! একেও কি তুমি বিয়ে বল নাকি? বিয়ের নামে এ ত' অত্যাচার। এ অত্যাচারের চেয়ে মেয়েটাকে আইবুড়ো করে' রাখাও ঢের ভাল ছিল।'

বলিয়াই সে আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আর কোনদিন কোন কথাই তাহাকে বলি নাই। কৃষ্ণার কথা উঠিলে আমার স্ত্রী তাহা শুনিতে চায় না। বলে, 'চুপ কর।'

চুপ করিয়াই ছিলাম। ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিতাম, আবার প্রয়োজন হইলে নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইতাম। কাঙ্গালীচরণ কি করিতেছেন না করিতেছেন কোনও সংবাদই লইতে পারি নাই।

সেদিন অমনি বাড়ী হইতে বাহির হইতেছি, কাঙ্গালীচরণের ঘরের ভিতর কেমন যেন বিশ্রী একটা গোঙানির শব্দ পাইলাম। তাকাইতেই দেখি—বিছানার ওপর শুইয়া শুইয়া তিনি ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন।

ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি আমার মুখের পানে কেমন যেন বিকারগ্রস্ত রোগীর মত একবার তাকাইলেন। তারপর অতিকষ্টে হাতের ইসারা করিয়া বলিলেন, 'বসুন!'

বিছানার একপাশেই বসিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হয়েছে?'

'জ্ব—র।'

'কখন থেকে?'

'আজ তিন দিন।'

দেখিলাম, এ অবস্থায় একাকী এরকম ভাবে তাঁহাকে ফেলিয়া রাখা অন্যায়। সেবা-শুশ্রূষার প্রয়োজন। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কৃষ্ণাকে নিয়ে আসব?'

কাঙ্গালীচরণ ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া আবার আমার মুখের পানে তাকাইলেন। দেখিলাম, ঠোঁট তাঁহার থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, 'আসবে?'

বলিলাম, 'দেখি চেষ্টা করে' যদি আসে!'

আর কিছু তিনি বলিতে পারিলেন না। চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

গায়ের উত্তাপ দেখিলাম, অত্যন্ত বেশি। চোখ দুইটি লাল। ডাক্তার ডাকিবার একান্ত প্রয়োজন ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিলাম।

ডাক্তার দেখিয়াই কাঙ্গালীচরণ আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন,

'ডাক্তার? কি জন্যে ডাক্লেন বলুন ত? আমার কি আর ডাক্তার দেখাবার পয়সা আছে? আচ্ছা দিন আপনি, তারপর সেরে উঠে না হয় ভাড়া থেকে বাদ দিয়ে দেবো।'

ডাক্তারের ঔষধ চলিতে লাগিল।

বৈকালে নিজে গিয়া কৃষ্ণাকে লইয়া আসিলাম। আসিতে কোন-প্রকার আপত্তি করিল না।

সেই কৃষ্ণা আবার আসিয়াছে। আমার স্ত্রীকে সাবধান করিয়া দিলাম, 'বিবাহ সংক্রান্ত কোনও কথা ওকে জিজ্ঞাসা ক'রো না।'

'কেন?'

'হয়ত দুঃখ পেতে পারে।'

গৃহিণী বলিল, 'না বললেও সে আমায় নিজে বল্‌বে।'

'তা বলুক্।'

দু'দিন কিছু বলে নাই।

বলিবার অবসরই বা কোথায়?' পিতার শিয়রে বসিয়া দিবারাত্রি তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে। শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, সেবারতা কৃষ্ণার সে কী রূপ! কি মাধুর্য্য! মুখে একটি কথা বলে না, এতটুকু বিরক্তি প্রকাশ করে না, আহার নিদ্রা ত' একরকম পরিত্যাগ করিয়াছে বলিলেই হয়।

আমার স্ত্রী সেদিন তাহার সেই শুষ্ক রুক্ষ চেহারা দেখিয়া বলিল, 'ও কি করছিস্, কৃষ্ণা, মরে' যাবি যে?'

কৃষ্ণা তাহার ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটুখানি হাসিল। সুবিন্যস্ত

সুশ্রী মুক্তার মত দাঁতগুলি দেখা গেল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না, মরব না বৌদি। মৃত্যু আমার নেই।'

শেষের কথাটি বলিতে গিয়া দেখা গেল, তাহার চোখ দুইটি অশ্রু-ভারে টল্‌মল্‌ করিতেছে।

কিন্তু এত যে সেবা, এত যে যত্ন, তবু সে তাহার পিতাকে রক্ষা করিতে পারিল না। চারদিনের দিন কাঙ্গালীচরণের বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কথা বলিবার জন্য কী তাহার ব্যাকুলতা! বিদায়-বেলায় কন্যাকে সে কি যেন বলিয়া যাইতে চায়! কিন্তু কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে চায় না। বিধাতা যেন স্বহস্তে তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিয়াছেন। প্রকৃতি এতদিন পরে হয়ত' তাহার এই বিদ্রোহী সন্তানের উপর প্রতিশোধ লইতেছে। কিন্তু আর কেন?

কাঙ্গালীচরণের দিকে বেশিক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে পারিলাম না, ছুটিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলাম। মৃত্যুর যে এত কষ্ট তাহা জানিতাম না। কাঙ্গালীচরণ মরিতে কোনোদিন চায় নাই, জীবনকে সে বড় বেশি ভালবাসিয়াছিল, তাই আজ তাহার এই ক্ষুদ্র গৃহ, নিজ-হাতে-গড়া গৃহের প্রত্যেকটি আসবাবপত্র, তাহার এই সযত্ন-সঞ্চিত কিঞ্চিৎ অর্থ, অকিঞ্চিৎকর সম্পদ্‌ সবই যেন আজ তাহার বিদায়ের যাত্রা-পথে দু'হাত বাড়াইয়া আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ তাহাকে যাইতেই হইবে।

সমস্ত দিবারাত্রি প্রাণপণে যুঝিয়া শেষ জীবনী-শক্তিটুকুও যখন তাহার নিঃশেষে ফুরাইয়া গেল—রাত্রি তখন প্রভাত হইয়া আসিয়াছে।

কৃষ্ণা ধীরে ধীরে আমার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম সব শেষ হইয়া গেছে। কিন্তু ঐ অতটুকু মেয়ে কৃষ্ণা নিদারুণ দুঃখকে এমন করিয়া চাপিয়া রাখিবার শক্তি পাইল কোথায়? কাঁদিল না, অধীর হইয়া ছটফট্ করিল না,—নীরব নির্ব্বিকার কৃষ্ণা যেন পাষাণ-মূর্ত্তির মত দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কাঙ্গালীচরণের মরিবার বয়স হইয়াছিল। সে-জন্য দুঃখ করিবার কিছুই নাই।

তিনদিন পরে কন্যাকে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। যৎসামান্য আয়োজন করা প্রয়োজন। কৃষ্ণাকে ডাকিয়া বলিলাম, 'জনকতক ব্রাহ্মণ ডেকে এনে শ্রাদ্ধটি চুকিয়ে ফেলি না, কি বল কৃষ্ণা?'

কৃষ্ণা নীরবে ঘাড় নাড়িল।

বলিলাম, 'টাকাকড়ি যা খরচ হয় আমিই দিচ্ছি, ভাড়া থেকে কেটে নেবো, তুমি ভেব না।'

কৃষ্ণা হাসিল। আবার সেই নীরব হাসি। এত দুঃখের দিনেও মুখে তাহার হাসি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গেছে।

নীচে স্নানের ঘরে আমার স্ত্রী কাপড় কাচিতেছিল, হঠাৎ রুদ্ধশ্বাসে সে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিয়াই হাঁপাইতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হলো?'

'হয়নি কিছু।' বলিয়া সে কাপড় ছাড়িয়া কৃষ্ণার কাছ হইতে একটুখানি দূরে সরিয়া গিয়া আমায় চুপি চুপি বলিল, 'শোনো।'

বলিয়া সে একবার দরজার দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল, 'হঠাৎ মনে হ'লো যেন কৃষ্ণার বাবা ঘুরে' বেড়াচ্ছেন। চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরে' বেড়াতে দেখতাম কি—না। গা'টা কাঁটা দিয়ে উঠতেই, মনে হ'লো পালাই। আবার ভাবলাম, থাক্, কাপড়টা কেচেই নিই। কিন্তু কাপড় কাচতে কাচতে হুবহু মনে হ'লো, নীচের ওই ঘরে কে যেন তালা খুলছে। মনে হলো ইঁদুরে অম্‌নি করছে। কান পেতে শুনতে লাগলাম। কিন্তু না বাপু, ইঁদুরে ও রকম শব্দ কখনও করতে পারে না। ভয়ে তাই পালিয়ে এলাম।'

'চোরটোর নয় ত'? দাঁড়াও দেখে আসি।' বলিয়া আলো লইয়া নীচে নামিয়া গেলাম। দেখিলাম, কোথাও কিছু নাই। মনে হইল কোথায় যেন মাত্র একটা ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডাকিতেছে। অমাবস্যার রাত্রি। চারিদিক ঘোর অন্ধকার। আকাশে মেঘ জমিয়াছে।

উপরে উঠিয়া আসিতেই কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি অমন হঠাৎ যে নেমে গেলেন দাদা?'

বলিলাম, 'তোমার বৌদি হঠাৎ ভয় পেয়ে ওপরে উঠে এলো' বললে, মনে হলো কে যেন নীচের এই অন্ধকার ঘরে তালা খুলছে। ইঁদুরে হয়ত' খুট্-খুট্ করছিল, ভীতু মানুষ—ভয়ে তখন ওর হয়ে গেছে।'

কৃষ্ণা নতমুখে চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

বলিলাম, 'কিরে, তুইও যে ভাবতে বসে গেলি! তুইও কি ভয়-টয় পাস্ নাকি? ভয় কিসের? ভয় পাসনে।'

কৃষ্ণা মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, 'চলুন দাদা, এ-বাড়ীটা ভাড়ায় বসিয়ে আমরা অন্য বাড়ীতে উঠে যাই।'

'কেন রে, তা কেন ?'

কৃষ্ণা ম্লান একটুখানি হাসিল। বলিল, 'না দাদা, বৌদি মিছে বলেনি। ও শব্দ আমিও শুনেছি। ও ইঁদুরের শব্দ নয়।'

আমার গৃহিণী এতক্ষণে জোর পাইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'শোনো। আমার কথা তুমি হেসেই উড়িয়ে দাও।'

বলিলাম, 'কৃষ্ণার কথাটাই বুঝি বিশ্বাস করব মনে করেছ ?'

'বিশ্বাস আপনাকে করতেই হবে দাদা, আসুন।' বলিয়া লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া কৃষ্ণা উঠিয়া দাঁড়াইল।

পাগলীটা আমাদের কোথায় লইয়া যায় দেখিবার জন্য তাহার পিছু-পিছু চলিতে লাগিলাম। কৃষ্ণা আগে-আগে, আর আমরা দু'জনে তাহার পিছু-পিছু। সিঁড়ি ধরিয়া নীচে নামিয়া গিয়া কৃষ্ণা চাবি দিয়া নীচের সেই অন্ধকার ঘরের তালা খুলিল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে ইঁদুরগুলো এতক্ষণ ছুটাছুটি করিতেছিল, মানুষ দেখিয়া ছুটিয়া পলাইল। কয়েকটা আরসুলা ফর্-ফর করিয়া উড়িতে উড়িতে আমাদের গায়ে আসিয়া বসিল। ঘরের মধ্যে আবার আর একটা ঘর। এ ঘরটা আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। দেখিবার প্রয়োজন হয় নাই। সে-ঘরেরও তালা খুলিয়া, দরজা ঠেলিয়া কৃষ্ণা আগে ঢুকিল। মেয়েটা কি সত্যই পাগল হইল নাকি ? কিন্তু পাগলামির কোনও চিহ্নই তাহার দেখিলাম না। ঘরখানা বাক্স-প্যাঁটরা জিনিষপত্রে ঠাসা। লণ্ঠনটা হাত হইতে নামাইয়া কৃষ্ণা একটা বাক্স খুলিল। খুলিয়াই হাতের আলোটা তুলিয়া ধরিয়া ডাকিল, 'দাদা আসুন !'

কাছে গিয়া যাহা দেখিলাম, বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া সেইখানেই হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা ছাড়া আর উপায় রহিল না। টাকা ও নোটের তাড়ায় বাক্সটা ভর্ত্তি। সংখ্যায় যে কত হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই।

কৃষ্ণা আবার বলিল, 'দেখলেন ?'

বলিতে গিয়া নীচের ঠোঁটটি তাহার থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

'এ কি তুমি আগে থেকে জানতে কৃষ্ণা ?'

কৃষ্ণার চোখে তখন জল আসিয়াছে। প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া 'না' বলিয়া হাতের লণ্ঠনটা তাহার পাশের একটা বাক্সের উপর নামাইয়া রাখিয়া, সেইখানেই সে বসিয়া পড়িল এবং সেই বাক্সের গায়ে লুটাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আমরা দু'জনে মিলিয়া কৃষ্ণাকে কিছুতেই আর থামাইতে পারি না। এতদিন পরে এমন করিয়া তাহাকে এই প্রথম আমি কাঁদিতে দেখিলাম।

—অলৌকিক

অনেকদিন হইতেই বিনয় আমাকে বলিতেছিল তাহাদেব দেশে যাইতে।

সময় পাই না, যাওয়াও হয় না।

সে বৎসব বৈশাখে আমার সময় হইল। বলিলাম, 'চল বিনয় এবাব বেরিয়ে পড়ি।'

কলিকাতা হইতে বেশী দূরের পথ নয়। সেই দিন রাত্রেই আমবা দুই বন্ধুতে রওনা হইয়া পড়িলাম।

আমের সময়। কিন্তু আশ্চর্য্য, গ্রামে তাহাদের এত যে আমের গাছ তা একটিতেও আমের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই।

বিনয় বলিল, 'অবাক্ হবার কিছু নেই। দুষ্ট ছেলেরা সব পাকবার আগেই পেড়ে পেড়ে খেয়ে ফেলে।

সেদিন সন্ধ্যায় আমরা দুই বন্ধুতে শালের বন দেখিয়া ফিরিতেছিলাম, দেখিলাম, গ্রামের মধ্যে একটা পোড়ো বাড়ীব মাঝখানে ছোট্ট একটি আমের গাছে তখনও পর্য্যন্ত প্রচুর আম ধরিয়া আছে।

একটা ঢিল তুলিয়া লইযা গাছেব গাযে ছুড়িতে গিয়াছি, খপ্ করিয়া বিনয় আমার হাতখানা ধরিযা ফেলিল।—'ঢিল ছুড়িস্‌নে, ও গাছের আম কেউ খায় না।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন?'

বিনয় বলিল, 'সে অনেক কথা। বাড়ী গিয়ে বলব চল্।'

বাড়ী আসিয়া বিনয় আমাকে যাহা বলিল তাহা এই—

*　　　*　　　*

সংসারে মাত্র দু'টি মানুষ। মা আর মেয়ে।

মা'র বয়স হয়েছে; মেয়ের বয়স এই সবে আঠারো-উনিশ, কিন্তু দু'জনেই বিধবা।

ঝগড়া-ঝাঁটি তাদের চব্বিশঘন্টা লেগেই থাকে! মেয়েটাই দিবারাত্রি খিটির্-মিটির্ করে; মার সঙ্গে ঝগড়া করবার ছুতো খুঁজে বেড়ায়। আবার অবাক কাণ্ড,—খুব খানিকটা ঝগড়া করে' নিজেই শেষে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে।

মা বলে, 'তুই একটা কিছু না করে' আর ছাড়বিনে দেখছি! মাথায় একপিঠ চুল এলিয়ে এই ভত্তি দুপুরবেলা কাঁদতে বসলি যে? আয় চুলগুলো বেঁধে দিই।'

এই বলে চুলগুলো বেঁধে দেবার জন্যই মা হয়ত' তার কাছে এগিয়ে যায়, কিন্তু মেয়ে তখন রেগে একেবারে টং! চুলে হাত দিতে সে কিছুতেই দেবে না। বলে, 'যাও যাও, খুব হয়েছে। তোমাকে আর—'

মা'র চোখদু'টি তখন জলে ভরে' আসে।

আঁচলে চোখ মুছে বলে, 'থাক্ তবে, কাঁদ্ ওইখানে!' বলে' ধীরে-ধীরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে গিয়ে এর বাড়ী খানিকক্ষণ বসে, ওর বাড়ী খানিকক্ষণ বসে, কথা কইবার মত কাউকে যদি কাছে পায় ত' বলে, 'ওই বয়েস আর ওই রূপ নিয়ে বিধবা হ'লো মা, মেয়েটার মুখের পানে আর তাকাতে পারছি নি।'

প্রতিবেশিনী, হয়ত' আশ্বাস দেয়। বলে, 'ভেবো না মা, গা-সওয়া হ'য়ে যাবে।'

মা কিন্তু তার নিজের কথাই বলতে থাকে। বলে, 'আমার কি মনে হয় জানিস্ বাছা, মনে হয়—এই নিয়ে সুবী হয়ত' দিবারাত্তির ভাবে। ভেবে আর যখন কিছু কূল-কিনারা পায় না, তখন হয়ত' ও অমনি করে। হয় কাঁদতে বসে নয়ত' ঝগড়া করবার জন্যে খুন্সুটি করে' বেড়ায়।'

প্রতিবেশিনী মেয়েটা এবার নীরবে শুধু ঘাড় নেড়ে কথাটা সমর্থন করে।

সুবীর মা তার মুখের পানে তাকিয়ে বলে, 'বুঝতে সবই পারি বাছা, কিন্তু মা হ'য়ে আমি যে আর—'

বলতে বলতে ঠোঁটদু'টি তার থর্ থর্ করে' কাঁপতে থাকে, চোখ দিয়ে দর্ দর্ করে' জল গড়িয়ে আসে।

সে চোখের জল আর কিছুতেই থামতে চায় না! আঁচল দিয়ে মোছে আর তৎক্ষণাৎ কানায়-কানায় ভরে ওঠে।

মা'র সে কান্না বুঝি বিধাতারও সহ্য হ'লো না। তাই সে কান্নার পালা হঠাৎ একদিন চুকে' গেল। বিধাতা চুকিয়ে দিলেন কি সুবী নিজেই চোকালে কে জানে!

সেদিন দুপুরে মা ও মেয়ে দু'জনেই খেতে বসেছে। ভাত চিবোতে গিয়ে কটাং করে' সুবী তার দাঁতে একটা কাঁকর চিবিয়ে ফেললে। হাতের গ্রাসটা তৎক্ষণাৎ সে থালার ওপর ছিটকে ফেলে দিয়ে বলে' উঠলো,—'না, আর পারিনে বাবা! কেন, চালগুলো বেছে নিতে পারোনি?'

মা বল্লে, 'চাল আর কত বাছব বাছা! ভাতে কাঁকর পাথর দু' একটা অমন থাকে। তাই বলে তোর মত এমন বিট্‌কেল্ কেউ করে না।—খা!'

মেয়ে আর না খেয়ে হাত গুটিয়ে বসে রইলো দেখে মা'র মনে সত্যিই এবার একটুখানি রাগ হ'লো। বললে, 'এমন তিরিক্ষে মেজাজ তোর কেন হ'লো সুবী? কই আগে ত' এমন ছিল না!'

সুবীর মুখখানা ভারি হ'য়ে উঠলো।

তাই না দেখে মা আবার বললে, 'এতই যদি নবাবের মেয়ে হ'য়ে থাকিস্ ত' চালগুলো কাল থেকে তুই নিজের হাতে বেছে দিস্।'

'তাই দেবো।' বলে' থালাটাকে হাত দিয়ে সরিয়ে সুবী উঠে দাঁড়ালো।

সর্ব্বনাশ! বিধবা মেয়ে, একবারের বেশি খেতে নেই! মা চট্ করে' বাঁহাত বাড়িয়ে তার আঁচলটা চেপে ধরে' বলে' উঠলো, 'বোস্ মা, বোস, চারটি খেয়ে নে। কেউ দ্যাখেনি, তাতে দোষ নেই, নে বোস্।'

ঝাঁকানি দিয়ে সুবী তার আঁচলটা ছাড়িয়ে নিলে। বললে, 'না, আর খাব না।'

'সারাদিন খেতে যে আর পারিনে হতভাগী, উপোস্ দিয়ে মরবি?'

'মরণ হ'লে ত' বাচি। মরণ যে হয় না ছাই।'

'তাই মর্ তুই। আমারও হাড়টা জুড়োয় তাহ'লে।'

বিড় বিড় করে' কি যেন বলতে বলতে সুবী আঁচাতে চলে গেল।

মা-ই বা আর কেমন করে খায়! থালাটা সরিয়ে দিয়ে মাও উঠে দাঁড়ালো।

খিড়কির পুকুর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে সুবী দেখলে, এঁটো থালা তেমনি পড়ে আছে, আর ঘটির জলে উঠোনে হাত ধুয়ে মা তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

মা সেদিন তার যেখানে-সেখানে কেঁদে কেঁদে সারা হলো। —"না মা, রইলো ওই দস্যি মেয়ে আমার বাড়ীতে, আমায় দেখছি কোনও দেশে গিয়ে পালাতে হ'লো।"

প্রতিবেশিনী মেয়েরা কেউ বা সান্ত্বনা দেয় আবার কেউ বা বলে, 'কি জানি মা, তোমাদের ঝগড়ার কিছু বুঝিনে আমরা।'

মায়ের চোখ দিয়ে জল আসে। বলে, 'বুঝতে কি ছাই আমিই পারি বাছা? ও যে কেন অমন করছে মা, তা কে জানে।'

মা আবার সে-বাড়ী থেকে উঠে' আর-এক বাড়ীতে গিয়ে বসে সেখানেও সেই কান্না আর ওই এক কথা! —'আজ আর আমি বাড়ী ঢুকছিনে। দেখি ও আমায় খুঁজতে আসে কি না!'

এমনি করে' এ-বাড়ী সে-বাড়ী করতে করতে সূর্য্য ডুবলো। রোজ ঠিক এমনি সময় পুকুর থেকে এক কলসী করে খাবার জল তাকে আনতে হয়। পাড়ার মেয়েরা সব কলসী কাঁখে নিয়ে পুকুরে যাচ্ছিল, করালীর মা বললে, 'চল না হয় আমার একটা কলসী নিয়েই চল আজকে।'

সুবীর মা বললে, 'না বাছা থাক্, আজ আর যাব না। মজাটা একবার বুঝুক্।'

মজা বোঝাবার জন্যে সে বসে রইলো বটে, কিন্তু দেখতে দেখতে চারিদিক আঁধার হয়ে এলো, ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বললো, তবু সুবী তাকে ডাকতে এলো না।

মা'র মন ঘর ছেড়ে এমন করে' কতক্ষণই বা বাইরে থাকে। তুলসীতলায় এখনও হয়ত সন্ধ্যে পড়লো না...এতক্ষণ হয়ত সে তার নিজের লণ্ঠনটি জ্বেলে নিয়ে রামায়ণ পড়তে বসে গেছে...মা তার মরলো না বাঁচলো বয়ে গেছে তার দেখ্‌তে!

সরু একটা গলির অপর প্রান্তে একেবারে এক টেরে তাদের সেই ছোট্ট মাটির ঘরখানি—চারিদিকে মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সদর দরজা পেরিয়েই বাঁহাতি উঠোনের এক পাশে বহুদিনের প্রাচীন একটা আমের গাছ—অজস্র ডালপালা বিস্তার করে জায়গাটাকে অন্ধকার করে' রেখেছে! তাহ'লেও ঘরে যদি আলো জ্বলে ত' বাইরে থেকেই টের পাওয়া যায়। কিন্তু আলো জ্বালা দূরে থাক্, সুবীর মা সদর দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখে, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ।

হেঁকে বললে, 'সুবী, দরজা খোল্! কাজ ত্যাখো দেখি মেয়ের! ঘরে ঢুকতে না দেবার মতলব!'

ভেতর থেকে সুবী সাড়া আর কিছুতেই দেয় না, দরজাও খোলে না!

কাছেই তারাপদদের বাড়ী। তারাপদ তখন সবেমাত্র গোয়ালে গাইগরুগুলিকে খেতে দিয়ে ঘরে এসে বসেছে, এমন সময় সুবীর মা এসে বললে, 'আয় ত' বাবা, সুবীকে একবার দিবে আচ্ছা করে' ধমকে! সদর দরজায় খিল্ দিয়ে বসে আছে, আমায় ঢুকতে দেবে না।'

তারাপদ হেসে বল্‌লে, 'ঝগড়া হয়েছে বুঝি?' বলেই লণ্ঠনটি

হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। দরজায় বার কতক জোরে-জোরে ধাক্কা দিয়ে বললে, 'খোল্ বল্ছি সুবী, নইলে কিছু বাকি রাখব না।'

দরজা তবু খুললো না।

লণ্ঠনটা হাত থেকে নামিয়ে তারাপদ বললে, 'তুমি দাঁড়াও মাসী,—আমি পাচিল টপকে দরজাটা খুলে দি।'

খাটো মাটীর প্রাচীর। উঠতে বিশেষ বেগ পেতে হ'লো না।

কিন্তু ঝুপ্ করে' ওপাশে নেবেই সন্ধ্যার আব্ছা অন্ধকারে কি যেন দেখে সে আমগাছের তলা থেকে সহসা বিকৃত কণ্ঠে. চীৎকার করে' উঠলো, 'মাসী! মাসী!'

বাইরে থেকে সুবীর মা বললে, 'কি বাবা?'

কিন্তু জবাব দেবার অবসর তখন আর নেই। হড়াম করে' দরজাটা খুলে ফেলেই তারাপদ কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলো। তাড়াতাড়ি লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে সে আম গাছের তলায় গিয়ে দেখে—সর্ব্বনাশ!

সুবীর মা ত' অস্ফুটকণ্ঠে বিকট একটা চীৎকার করে' সেইখানেই আছাড় খেয়ে পড়লো—

আর স্তম্ভিত নির্ব্বাক্ তারাপদ কম্পিত হস্তে লণ্ঠনের আলোটা তুলে ধরে' দেখলে—আম গাছের একটা ডালের গায়ে মোটা একটা দড়ির ফাঁসি লটকে' সুবী আত্মহত্যা করেছে! পায়ের নীচে দড়িব ভাঙা খাটিয়াটা উল্টে পড়ে' আছে। টকটকে ফর্সা গায়ের রং যেন দুধে-আলতায় গোলা, পিঠের ওপর ঢেউ-খেলানো কালো একপিঠ চুল, কিন্তু মুখের চেহারা দেখলে আর সে-সুবী বলে চেনবার উপায় নেই, দাঁতের ফাঁকে খানিকটা জিভ বেরিয়ে গেছে, চোখদু'টো বড় বড়,

গায়ের কাপড়-চোপড় বেসামাল অবস্থায় মাটিতে লুটোচ্ছে! হতভাগী মরবার আগে বাঁচবার জন্যে চেষ্টা করেছিল কিনা তাই-বা কে জানে!

* * *

বাস্! সমস্ত গ্রাম একেবারে ঠাণ্ডা!

গ্রামদেশে আত্মহত্যা এমন কিছু নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা নয়, দু'দশ বছর পরে কদাচিৎ কোনও গ্রামে দৈবাৎ যদিবা এক আধটা এমন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে যায় ত' কিছু বলবার থাকে না।

এখন এ মৃতদেহ নিয়ে কি করা যায়—এই হ'লো গ্রামের লোকের ভাবনা। আত্মীয়স্বজন কেউ কোথাও তাদের আছে কি না কে জানে। সুবীর মা ত' সেই যে মাটিতে উপুড় .হয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে সেই থেকে আর ওঠে নি।

শিব মন্দিরের পাশে গ্রামের একটা রাস্তার ধারে সেই রাত্রেই মজলিস বসলো। অনেক কথা কাটাকাটির পর শেষে এই ঠিক হ'লো যে, কি জানি বাবা, আত্মহত্যার মড়া শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে আসবার পর কেউ যদি পুলিশে খবর দিয়ে দেয় যে, সে আত্মহত্যা করেনি, কেউ তাকে মেরে ফেলে দিয়ে গাছে অমনি টাঙিয়ে রেখেছিল —তখন?······তার চেয়ে আগে থেকেই পুলিশে খবর দেওয়া হোক্।

গ্রাম থেকে তিন ক্রোশ দূরে থানা। কিন্তু সুবীর দুর্ভাগ্য, চৌকিদার ফিরে এসে খবর দিলে—'দারোগা সাহেব ছুটি নিয়ে বাড়ী গেছেন, জমাদার সাহেব আসবেন কাল সকালে। বলেছেন, দাঁড়া আমি দেখাচ্ছি মজা, গলায় দড়ি দিয়ে মরা আমি বের করছি।'

গ্রামের লোক ত' ভয়ে অস্থির !

দুগু ভট্‌চাজ্‌ বললে, 'কেন তখনই ত' বলেছিলাম দাদা, পুলিশে খবর দিয়ে কাজ নেই ; দিই জ্বালিয়ে।'

লোকনাথ দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠলো।—'ব্যাটা বলে কি হে! তারপর ? তারপর ঠেলাটি কে সাম্‌লাতো ?'

দুগু বললে, 'ঠেলা আবার কিসের ?'

হরিপদ তাকে বুঝিয়ে দিলে যে, কেউ যদি বলতো যে, না ও গলায় দড়ি দিয়ে মরেনি, দুগু ভট্‌চাজের সঙ্গে দিনের বেলা ঝগড়া-ঝাঁটি না কি-সব যেন হয়েছিল—

দুগু ভট্‌চাজ্‌ কালা মানুষ, কানে ভাল শুনতে পায় না। এদের আগেকার মন্তব্য সে কিছুই শোনেনি। হরিপদর মুখে তার নাম শুনে সে চীৎকার করে লাফিয়ে উঠলো—'খবরদার বলছি হরিপদ, মিছে কথা বলিস্‌নে। আমার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয়নি।'

সবাই তখন মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছে।

হরিপদর সঙ্গে শেষে হাতাহাতি হবার যোগাড় ! অনেক কষ্টে ভট্‌চাজকে থামানো গেল। কিন্তু পরদিন সকালেও থানা থেকে জমাদার সাহেব এলেন না।

গ্রামে মানুষ মরেছে, বাসি-মড়া ত' হ'লোই. তার ওপর আত্মহত্যার মড়া। ঠাকুর দেবতার শিলা-বিগ্রহের নিত্য সেবা যাদের বাড়ীতে আছে তারা ত' ভেবেই অস্থির। ঘর থেকে মৃতদেহটাকে বের না করা পর্য্যন্ত ঠাকুর-দেবতার পূজো হবে না, এবং পূজো যারা করবে, পূজো না হলে তাদের জল গ্রহণ করার উপায় নেই।

লোকনাথের বাড়ী প্রত্যহ শালগ্রাম শিলার ভোগ হয়। সকালে উঠেই ভিন্নগ্রামে সে একটা প্রায়শ্চিত্ত করাতে গিয়েছিল, প্রায় বেলা বারোটার সময় তেতে-পুড়ে ফিরে এসেই শুনলে, পুলিশও আসেনি এবং মড়া তখনও ঘরের উঠোনেই পড়ে' আছে। মড়া দেখতে যারা গিয়েছিল, সকাল থেকে সুবীর মা নাকি তাদের প্রত্যেককেই কেঁদে কেটে হাতে পায়ে ধরে' মড়াটাকে একটুখানি বের করে' দেবার জন্যে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু কেউ তা শোনেনি।

লোকনাথের তখন পিপাসায় কণ্ঠরোধ হয়ে এসেছে। ভেবেছিল, বাড়ী গিয়ে শালগ্রামের পূজোটা করে দিয়েই জল খাবে। কিন্তু তাও যখন হ'লো না তখন সে নিজেই হন্ হন্ করে' বেরিয়ে গেল।

আপাদমস্তক ঢাকা-দেওয়া সুবীর মৃতদেহ আগলে, দেখা গেল, মা তার আমগাছের তলায় একাকিনী চুপ করে' বসে' আছে। চোখে জল নেই, মুখখানি শুকনো,—কেঁদে কেঁদে সে যেন হায়রাণ হয়ে গেছে।

দরজার বাইরে থেকে লোকনাথ চেঁচিয়ে উঠলো—, 'বলি ও ঠাকরুণ, মেয়ে ত' না হয় সাতকুল উজ্জ্বল করে দিয়ে মলো, তাই বলে' কি ও হারামজাদীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও মরতে হবে নাকি? মড়া বের না করলে যে ঠাকুরের ভোগ হয় না!'

মুখ তুলে একবার চাইতেই সুবীর মার চোখ দিয়ে দর্ দর্ করে' জল গড়িয়ে এলো। কথা সে কিছুই বলতে পারলে না, গলা তখন তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

লোকনাথ ভাবলে বুঝি মাগী এইবার হয়ত তাকেই অনুরোধ

করে' বসবে। রাগের মাথায় অতটা সে এখানে আসবার আগে ভাবেনি, তাই সে তৎক্ষণাৎ ঘোৎ-ঘোৎ করতে করতে সেখান থেকে চলে গেল।

জমাদার-সাহেব এলেন সন্ধ্যের সময়। পিল্ পিল্ করে' লোক-জন তাঁর পিছু পিছু ঢুকলো সুবীদের বাড়ী।

কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে, আমগাছের তলায় সেই ভাঙ্গা খাটিয়াটা মাত্র পড়ে আছে, সুবীর মৃতদেহও নেই, সুবীর মাও নেই।

কোথায় গেল তারা? বাগ্‌দিদের একটি ছোঁড়া আঙুল বাড়িয়ে দূরের একটা পুকুর দেখিয়ে দিয়ে বললে, উ-ইখানে বসে রয়েছে দেখলাম।'

কিন্তু কখন যে সেখানে গেছে কেউ তা জানে না। লোকনাথ চলে যাবার পর সুবীর মা নিতান্ত নিরুপায় হয়ে নিজেই একবার মৃতদেহটা তার কাঁধে করে তুলে নিয়ে যাবাব চেষ্টা করেছিল কিন্তু ভারি সে মৃতদেহ কাঁধে তোলা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। তখন সে সুবীর মাথার দিকটা দু'হাত দিয়ে ধরে' কোনরকমে টেনে টেনে তাকে ঘরের বার করে এবং অমনি করেই একটু একটু করে' দূরের ওই পুকুরটায় নিয়ে গিয়ে ফেলে। আরও দূরে নিয়ে হয়ত সে যেতো কিন্তু পুকুরের চারিপাড়ে শুধু শক্ত শক্ত কাঁকর আর পাথরের কুচি, এইতেই সুবীর রাঙা টুকটুকে পা দুখানি পথের ধূলোয় ম্লান হয়ে গেছে, তার ওপর মা হয়ে ওই শক্ত কাঁকর-পাথরের ওপর দিয়ে মেয়েকে তার হিড়্‌হিড়্ করে' টেনে নিয়ে যায়ই বা কেমন করে'? তাই সে ওইখানেই চুপটি করে' বসে' আছে।

জমাদার সাহেব ভেবেছিলেন যা এসে দেখলেন ঠিক তার উল্টো। ভেবেছিলেন, অবস্থাপন্ন লোকের বিধবা মেয়ে, আত্মহত্যা করেছে, মর্গে চালান দেবার নামে বেশ একটু ধমকা-ধমকি করলেই কিছু বেরিয়ে আসবে। সাহেবের স্ত্রী নাকি অন্তঃস্বত্তা, বাড়ীতে এ'মাসে মোটারকম টাকা পাঠানো তাঁর একান্ত প্রয়োজন। সারা রাস্তা তিনি তাই ভাবতে ভাবতে এসেছেন—আত্মহত্যা করে' মানুষ মরেছে, তার দরুণ টাকা ঘুষ নিয়ে তিনি বাড়ীতে পাঠাবেন, আর সেই টাকা খরচ হবে তার সন্তানের জন্মোৎসবে!—তা হোক্, পুলিশের কাজ করে অত-সব ভাবতে গেলে চলে না!

কিন্তু সাহেবের দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না, কিছু না নিয়েই তাঁকে ফিরতে হ'লো। মৃতদেহ সংকার করবার হুকুম তিনি দিয়ে গেলেন।

শীতকালের রাত। মৃতদেহ সংকারের পর স্নান করতে হবে। তার ওপর রাত্রে আর বাড়ী ফিরতে নেই। শ্মশানেই রাত কাটাতে হয়। সুতরাং কেউ আর বাড়ী থেকে সহজে বেরোতে চায় না!

গামছা কাঁধে নিয়ে লোকনাথ এসে দাঁড়ালো।

হুগু ভট্চাজ লাফিয়ে উঠলো—'বাস্, কাউকে চাইনে। একজন সঙ্গী পেলে আমি একাই পুড়িয়ে ফেলতে পারি।'

লোকনাথ ঘাড় নেড়ে বললে 'উঁহুঁ, ভেবে দেখলাম, পোড়ানো চলবে না।'

সকলেই তার মুখের পানে তাকিয়ে আর কি বলে শোনবার জন্যে উৎগ্রীব হয়ে রইলো।—বাঁচালে বাবা! শীতকালের রাত·····

লোকনাথ বললে, 'একে গলায় দড়ি, তায় বাসি মড়া, অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত না করলে ওর মুখাগ্নি চলবে না, আর মুখাগ্নি না করে অগ্নি-ক্রিয়া করতে দোষ আছে। তাছাড়া যারা ওকে নিয়ে যাবে তাদেরও যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে!

কে যেন বলে উঠলো—'তাহ'লে দরকার নেই বাপু!'

ভুবন তার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে' মহা উৎসাহে গামছা কাঁধে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, লোকনাথের কথা শুনে মা তার দরজা থেকে ডাকলে, 'ওরে ও ভুবন! তাহ'লে চলে আয় বাবা! শুনছিস ত!'

লোকনাথ বললে, 'শাস্ত্রে বলছে—গলরজ্জুঃ বৃক্ষশাখাযাং ত্রিসন্ধ্যাং কালেং যদি মৃত্তিকায়াং প্রোথিতঞ্চ অগ্নিক্রিয়া নৈবচ নৈবচ।—এর পরেও যদি কেউ যেতে চায় ত যাক্—আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে আমার বিবেচনায় গ্রামের দু'জন বাউরি-বাগদি নিয়ে ওকে পুতে ফেলাই উচিত।'

এমন সময় বিকট একটা চীৎকারের শব্দে সবাই যেন চম্‌কে উঠলো। গ্রামের বাইরে থেকে চীৎকার। মনে হ'লো যেন স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর!

হঠাৎ খেয়াল হ'লো স্থবীকে আগলে স্থবীর মা সেই পুকুরের ধারে একাকী এই অন্ধকারে এখনও চুপ ক'রে বসে আছে। সেই তারই গলার আওয়াজ!

ব্যাপারটা দুগু ভট্‌চাজ ভাল বুঝতে পারেনি, হাঁ করে এর ওর মুখের পানে তাকিয়ে বললে 'কি?'

কে একজন জোরে জোরে তাকে বুঝিয়ে বললে, 'স্থবীর মা চেঁচাচ্ছে।'

এই কালা-ক্ষ্যাপা মানুষটির কোথায় গিয়ে যে বাজ্‌লো কে জানে, সর্ব্বাগ্রে সে উঠে দাঁড়ালো এবং আর কাউকে কোনও কথা না জিগ্যেস্ করে একাই সে সেইদিক পানে চলে গেল।

খানিক পরে, তার দেখাদেখি জন দশ-বারো গ্রামের ছোক্‌রা প্রত্যেকেই হাতে একটা করে' লণ্ঠন নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখে, পুকুরের পাড় থেকে খানিক দূরে একটা মাঠের ওপর দুগু ভট্‌চাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে আর তার পায়ের কাছে সুবীর মৃতদেহ অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে আছে।

ব্যাপার কি?

দুগু ভট্‌চাজ্ বললে, এক পাল শেয়াল এসেছিল আর দুটো বড় বড় গো-বাঘা! বাপ্ রে বাপ্! ব্যাটাবা ছাড়তে কি চায়! ওই গ্যাখো না, পায়েব কাছটা কেমন করে' খুব্‌লে নিয়েছে।'

দেখা গেল, সুবীর বাঁ-পায়ের আঙ্গুলগুলো একরকম নেই বললেই হয়। তাছাড়া সর্ব্বাঙ্গে তীক্ষ্ণ দাঁতের চিহ্ন।

মা তার তখনও একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজের পরিধেয় বস্ত্রটা সাম্‌লাচ্ছে। কারণ, ওরই সঙ্গে প্রথমে কাড়াকাড়ি সুরু হয়। এবং জন্তু জানোয়ারের মুখ থেকে কন্যার মৃত দেহটাকে বাঁচাতে গিয়ে পরণের কাপড়খানা, তার একেবাবে শতচ্ছিন্ন জর্জ্জরিত হযে গেছে।

লোকনাথও ছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে। বললে, তা হ'লে ওই ব্যবস্থাই হোক্। দুগু যখন মড়াটা ছুঁয়েইছে তখন ও-ই যাক্ শ্মশানে, সঙ্গে আরও জন কতক বাউরী বাগ্‌দি নিক, নিয়ে বেশ ভাল করে' পুঁতে দিয়ে আসুক। অগ্নিক্রিয়া যখন হবেই না তখন পোঁতা ছাড়া

আর উপায় কি! কিন্তু শোনো ভট্‌চাজ, যেন শেয়াল কুকুরে টেনে না বের কর্‌তে পারে।'

শেষ পর্য্যন্ত তাই হলো।

মা তার একটি প্রতিবাদও করলে না।

দু' একদিন পরেই দেখা গেল, গ্রামের খেঁকি কুকুরের দলে কিসের যেন একটা মহোৎসব লেগে গেছে। খাওয়া-খাওয়ি মারামারি করে তারা ক্রমাগত গ্রামের চতুর্দ্দিকে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে।

নিবারণ বললে, মেষের পুকুরের পাশে সুবীব আস্ত একখানা হাত নিয়ে কয়েকটা কুকুরকে কামড়াকামড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি করতে সে দেখে এলো। তোমাদের বিশ্বাস না হয় ত' তোমরাও স্বচক্ষে দেখে আসতে পার।

তারপর শুধু হাত নয়, সেই দিনই গ্রামের ছেলে ছোকরার দল আবিষ্কার করলে যে, সুবীর মৃতদেহ শেয়ালে গো-বাঘায় মাটি থেকে টেনে ত' তুলেইছে এবং হাত পা আর পাঁজরার হাড়গুলো শ্মশান থেকে মুখে করে' এনে সমস্ত গ্রামময় ছড়িয়ে চলেছে।

কুকুর দেখলেই ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলো বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় সুবীর হাড় দেখবার জন্যে। কিন্তু ফিরে তারা আর বাড়ী ঢুকতে পায় না।

মা'রা সব হাঁ হাঁ করে চেঁচিয়ে ওঠে...'খবরদার বলছি, ঘরে ঢুকিস্‌নে। মড়া মানুষের হাড় নাকি ছুঁয়ে এলি—যা, পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আয় গে।'

কাউকে বা ডুব দিতে হয়, কেউ বা মাথায় জল ঢালে আবার

কাউকে বা মাথায় একটুখানি গঙ্গাজল ছিটিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হয় যে আর কখনও সে সুবীর হাড় দেখতে যাবে না!

গ্রামের মধ্যে বয়স্ক যারা তাদের মজলিসে এই নিয়ে কথা উঠে। বলে, সর্ব্বনাশ হ'লো দেখছি। এই বার ঘরে ঘরে ভূত নাচবে।

নিবারণ বললে, 'ওই শালা দুগু ভট্‌চাজ্‌কে যে এত করে' বলে দেওয়া হলো—ভাল করে পুতিস্ যাতে শেয়ালে কুকুরে না তুলতে পারে, তা শালা দিয়ে এসেছে হয় ত এম্‌নি নাম-নাম পুঁতে, তা না হ'লে এমন হয় কখনও?

দুগু ভট্‌চাজ্ বললে, 'মাইরি বলছি আমি এক বুক গর্ত্ত খুঁড়ে তবে পুতেছিলাম। বিশ্বাস না হয় ত বল—আমি ঠাকুর ঘরে হাত দিয়ে বলতে পারি।'

কিন্তু সে কথা কেউ বিশ্বাস করে না। বলে, গ্রামের মধ্যে ভূতের ভয় যদি হয় ত' শালা বুঝতেই পারবি, তোকে সুদ্ধ খণ্ড খণ্ড করে কেটে আমরা সুবীর সঙ্গী করে দেবো।

ভট্‌চাজ্ কালা মানুষ, শুনতে পায় না তাই রক্ষে, নইলে তৎক্ষণাৎ একটা ফৌজদারী বেঁধে যেতো।

*　　　*　　　*

সেদিন থেকে এমন হলো যে, সন্ধ্যে হলে আর কেউ বাড়ী থেকে বেরোতে পারে না। অপমৃত্যুতে মড়া মানুষের হাড় পাঁজরা যখন গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে তখন তার প্রেতাত্মাই বা গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে না কেন?

নবীন বললে, মাইরি বলছি আমি কাল স্বচক্ষে দেখেছি, সুবীদের বাড়ীর পাশ দিয়ে সন্ধ্যেবেলা পেরিয়ে যাচ্ছিলাম, আমগাছটা ঝড় ঝড়

করে' নড়ে উঠলো। গা'টা শিউরে উঠতেই 'রাম রাম' বলতে বলতে এগিয়ে গেলাম। রাম নাম করেছিলাম বলে, ছুঁতে আমায় পারলে না, কিন্তু পেছনের পুকুরটার জলে মনে হলো কে যেন ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়লো।'

এই না শুনে গ্রামের গিরিশ চৌকিদার ত রাত্রিবেলা এ পাড়ায় হাঁক দেওয়া এক রকম ছেড়েই দিলে। আবাল-বৃদ্ধবণিতা ভূতের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। অন্ধকারে হঠাৎ কুকুর বেড়াল দেখলেও লোকে আচম্কা চেঁচিয়ে উঠতে লাগলো।

সুধীর মা ত' সেই দিন থেকে অন্ধকারে অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়, যে আমগাছে দড়ি বেঁধে মেয়ে তার মরেছিল গভীর রাত্রে সেই আম গাছটার তলায় চুপটি করে বসে থাকে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলে, 'কোথায় মা, তার চিহ্নও কোন দিন দেখতে পাই না। বলেই সে কাঁদতে থাকে।

লোকে তা বিশ্বাস করে না। ভাবে বুঝি মাগী মিথ্যা কথা বলছে।

লোকনাথ তাই সেদিন দুপুরে তাকে ডেকে বললে, 'ওগো শোনো। তুমি ত' দিব্যি আরামে দিন কাটাচ্ছ, এদিকে তোমার মেয়ের দায়ে আমাদের গ্রামে টেঁকা ভার হয়ে উঠলো দেখছি। তার চেয়ে শোনো বাপু, ভাল চাও ত' গয়ায় গিয়ে মেয়ের নামে একটা পিণ্ডি দিয়ে এসো।'

গ্রাম ছেড়ে যাবার ইচ্ছে সুধীর মার ছিল না, তবু তাকে জোর করে' সবাই মিলে বলে-কয়ে গয়ায় পাঠিয়ে দিল! বেচারা একাকিনী কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল গয়ায়। মেয়ের নামে দুর্নাম রটবে তাই-বা

সে সহ্য করে কেমন করে'? অথচ সে নিজে যদি তাকে একটীবার দেখতে পেতো! মায়ের মন—যে মেয়ে তার রাগ করে চলে গেছে তাকেই সে একটিবার শুধু চোখে দেখতে চায়! শ্মশানের যে জায়গাটায় সুবীকে পোঁতা হয়েছিল, সুবীর মা সেইখানে বসে বসে কাঁদতে লাগলো। ভাবলে, না সে গয়ায় যাবে না। ভূত হয়েও মেয়েটা যদি একবার দেখা দেয়। গয়ায় পিণ্ডি দিলে সে আশাও হয়ত আর থাকবে না। সুবীর মা ভাবলে রাত্রিটা সে আজ এই শ্মশানেই কাটিয়ে দেবে। ভূত হয়েও যদি সে আসে ত' তাকে একবার জিজ্ঞেস্ করবে হতভাগী রাগ করে' তুই কেন গেলি!

সারারাত সুবীর মা সেই অন্ধকারে শ্মশানের মাঝখানে বসে রইল।

এদিকে গ্রামের লোকে জানে যে সে গয়ায় গেছে।

দিন দুই পরেই গ্রামের মধ্যে আবার এক হুলুস্থুল ব্যাপার!

থানা থেকে পুলিশ এসেছে। গ্রামের জনকতক ভারিক্কি মাতব্বর লোককে তারা থানায় নিয়ে যাবে। কি জন্যে নিয়ে যাবে জিজ্ঞেস্ করলে বলে না। বলে শুধু সেখানে গিয়ে কি একটা বস্তু সনাক্ত করতে হবে।

জ্বালাতন।

এই গ্রামের ওপরেই যত অত্যাচার রে বাবা!

লোকনাথ বললে, 'দাঁড়া তবে আর ভূতের উপদ্রব বলেছে কাকে?' বললে, 'গয়া থেকে সুবীর মা ফিরে আসুক, এলেই দেখবি সব হাঙ্গামা চুকে যাবে।'

কিন্তু গ্রামের লোক থানায় গিয়ে দেখে, কাঠের একটা বাক্সের মধ্যে সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা কি একটা জিনিষ। ইন্সপেক্টর বাবু বলিলেন, 'দেখুন দেখি চিনতে পারেন কিনা?' বলে, যেই ঢাকা খুলেছে আর সবারই চক্ষুস্থির।

সবাই দেখলে, রেলের লাইনে কাটা তাল-গোল-পাকানো একটা মৃতদেহ, মুখখানা কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত দেখলে চেনা যায়—সুবীর মা বুড়ী আর কেউ নয়!···

বাস্, সেই অবধি সুবীদের বাড়ীখানা রইলো অমনি পড়ে। মানুষ বাস করা দূরে থাক, সন্ধ্যের অন্ধকারে ও পথ দিয়ে কেউ আর সহজে যেতে চায় না; যেতে হ'লে এখনও গা ছম্‌ছম্ করে। প্রথম বৎসর ঘরের খড়ো চাল গেল উড়ে, দ্বিতীয় বৎসর কাঠামোটাও গেল ভেঙে,—আজকাল খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধু ওই চারপাট মাটির দেওয়াল। যে আমগাছে সুবী মরেছিল, গাছটা এখনও ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। বছরের পর বছর ঠিক সময়ে তার শুক্‌নো পাতা ঝরে পড়ে, কচি কচি পাতা গজায়, মুকুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়ে ওঠে, শেষে থলো থলো আম ধরে।' কিন্তু গ্রামের মধ্যে এত যে ডানপিটে ছেলে তা কেউ আর সাহস করে' ও আমগাছটার তলা দিয়ে পেরোয় না—ও আমও কেউ খায় না—গাছের আম গাছেই পাকে। আবার সময় হ'লে ঠিক মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি যায়।—

